# অপূর্ব্ব-বাসর ।

( উপন্যাস )

“সুর-সঙ্গীত” রচয়িতা প্রণীত ।

‘সাহিত্য-সেবক’ হইতে উদ্ধৃত

( পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত । )

“————In every land
I saw wherever light illumineth,—
Beauty and anguish walking hand in hand
The downward slope to death.”

—*Tennyson.*

“The fatal gift of beauty which became
A funeral dower of present woes and past—”

---

PUBLISHED BY THE
STUDENT'S LIBRARY
*97 College Street*
1902.

# উপহার।

দলিত হৃদয়-স্রুত তপ্ত অশ্রু জলে
যতনে গাঁথিয়া মালা তব করতলে,
—শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি রাগে করি মনোহারী-
সঁপিলাম,—ধরিবে কি "বিপিন-বিহারী" ?
ভারতীর প্রিয় পুত্র—কমলা-আশ্রিত,
প্রশান্ত জ্ঞানের সিন্ধু—গুরু—সুচরিত।

---

# উৎসর্গ।

যেমন লোকে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া থাকে—দেবতার ফুল লইয়া দেবতাকেই অর্চ্চনা করে—তদ্রূপ যাঁহার চরিতাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক খানি রচিত হইল—তাঁহাকেই ইহা অর্পণ করিলাম।

# অপূর্ব্ব-বাসর।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### পরিভ্রষ্ট পল্লী।

মহানগরী কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। এই উপাখ্যানোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অদ্যাপি অনেকেই জীবিত,—এইজন্য এবং অন্যান্য কারণে আমরা উহার প্রকৃত নাম গোপন করিয়া "কন্দর্পপুর" নামেই অভিহিত করিলাম। এককালে এই গ্রাম খানি সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বিলাস-ভবন ছিল, কিন্তু সর্ব্ব-সংহারক কালের ভীষণ অত্যাচারে এখন ইহা পূর্ব্বসৌন্দর্য্য—পূর্ব্ব

গৌরব হারাইয়া শ্মশান সদৃশ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপ-সমূহ বিরাট পুরুষের অস্থিপঞ্জররাশির ন্যায় পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। যে স্থান এককালে সৌভাগ্য-শশীর হৃদয়োন্মাদিনী জ্যোৎস্না-প্রভায় সর্ব্বদা উদ্ভাসিত ছিল, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়ালাপে, বালক-বালিকার সরল সুমধুর হাস্যে সর্ব্বদা হাস্যময় ছিল—হায়, আজি সেই স্থান নিস্তব্ধ—নিরানন্দ!—যেন ভয়ঙ্কর শ্মশানের ন্যায় বিকট মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু নিষ্ঠুর কাল যতই উপদ্রব করুক, প্রতিদ্বন্দ্বী স্বভাবের ভাব কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। ঐ দেখ, কাল ঐ বহুকালের সৃষ্ট শ্মশানভূমিকে আজি একটি রমণীয় পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিয়া, সযত্নে কতশত ফুল ফুটাইতেছে—স্বভাব হাসিতেছে বটে, কিন্তু সে হাস্যে বিহ্বলতা নাই—সে আনন্দে মত্ততা নাই! নির্জ্জন গিরিকন্দরে, কলনাদিনী নির্ঝরিণী তীরে ঐ অসংখ্য বন্য-প্রসূন-মুখে স্বভাবের যে হাসি, আর ঐ কালপুরুষের বহুযত্ন-প্রসূত রমণীয় পুষ্পোদ্যানেও সেই হাসি!—আবার দেখ, ঐ যে অমরাবতী তুল্য মনোহর নগরটি বিপর্য্যস্ত করিয়া, কাল ঐ ভয়ঙ্কর শ্মশানের সৃষ্টি করিল,—ভাবিল, এইবার স্বভাবকে পরাভূত করিবে; কিন্তু ঐ দেখ, ঐ ভীষণ শ্মশানের একপ্রান্তে একটী ক্ষীণ তরুর দু' একটী ক্ষীণতর পুষ্প-মুখে, স্বভাব মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া, যেন কালকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, 'আমি সমভাবেই থাকিব, কিছুতেই আমার এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইবার নয়; আমি অনন্তকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এইভাবেই আছি, আবার অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই ভাবেই থাকিব!'—

—সুতরাং, আমাদের কন্দর্পপুর গ্রামখানি কালের ভীষণ দণ্ডে নিষ্পেষিত, ভয়ঙ্কর অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াও স্বভাবের অনুগ্রহে বঞ্চিত হয় নাই। ঐ দেখ, প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী তখনও যে ভাবে উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সাগরাভিসারিণী হইতেন, এখনও সেই ললিত-মন্থর-মৃদু তালে নাচিতে নাচিতে—মনোবিমোহন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে যাইতেছেন! তবে কিনা বালবিধবা সুন্দরী যুবতীর ন্যায় এখনকার সৌন্দর্য্য যেন কিছু দীপ্তিহীন—ম্রিয়মাণ! যেন মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কিছু মলিন-প্রভ! যেন বলিতেছে, 'অনুকূল পবন-বলে এ মেঘখণ্ড অপসৃত হইলেই, পুনর্ব্বার রূপের ছটায় জগৎ হাসাইব—আপনি হাসিব—হৃদয় খুলিব —সুধা ঢালিব, নতুবা এজন্ম এই রূপেই যাইবে!'

ছি! ছি! ভাগীরথী! এখনও কি মা তোমার সেই পূর্ব্বের ন্যায় মনোমুগ্ধকর নৃত্য,—সেই অর্দ্ধস্ফুট কুলুকুলুধ্বনি,—সেই মৃদু-মন্দ হাস্যলহরী—তোমার ও মুখে কি আর ভাল দেখায় মা?—যখন তোমার ঐ নির্ম্মল সলিলে কন্দর্পপুরের কুলবধূরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া মুখকমল ভাসাইত,—যখন তুমি ধীর-মৃদু তরঙ্গাঘাতে তাহাদের সেই কমনীয় দেহলতা সাদরে ধীরে ধীরে দোলাইতে দোলাইতে আনন্দে বিহ্বল হইতে,—যখন গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ তোমার ঐ কলুষ-হারি পবিত্র জলে স্নাতঃ হইয়া পবিত্র মনে 'মাতঃ শৈলসুতা সপত্নি' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ভক্তি-গদ্গদস্বরে তোমার স্তুতি গান করিতেন,—দিবাবসানে যুবক-সম্প্রদায় যখন তোমার ঐ সুনির্ম্মল সৈকত দেশে সমাসীন হইয়া হর্ষোৎফুল্লমনে তোমার অতুল রূপরাশি নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিত,—তখন তোমার এ হাস্য—এ নৃত্য—এ সুধামাখা

সঙ্গীত-লহরী শোভা পাইত—কিন্তু এখন? এখন আর তুমি সেই হাসি হাস কেন?—সেই তরঙ্গ নাচাও কেন?—কন্দর্প-পুর এখন জনশূন্য-প্রায়—নিস্তব্ধ-শ্মশান! এ মহাশ্মশানে কি তোমার ও গান ভাল শুনায়? এখন, ও মধুর ললিত-রাগিণী পরিত্যাগ করিয়া একবার বিষাদ সঙ্গীত গাও দেখি—শুনিতে বড় মিষ্ট লাগিবে!

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## জাহ্নবী পুলিনে।

শরৎ অতীত প্রায়। মৃদু-নিনাদিনী জাহ্নবী এখনো যৌবন-গর্ব্বে স্ফীতবক্ষে তর তর বেগে সাগর অভিমুখে ছুটিতেছে। আজি বিজয়া দশমী—সন্ধ্যা অতীত। জগৎ-প্রসূতি মহামায়ার প্রতিমূর্ত্তি গঙ্গার পবিত্র জলে এইমাত্র বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তগণ নিরানন্দমনে শূন্য-গৃহে ফিরিতেছে। বাদিত্রের উচ্চ করুণধ্বনি দিগ্দিগন্তে প্রতিহত হইতেছে। নদীতট জনশূন্য। নির্ম্মল নীলাকাশে দশমীর চন্দ্র বিষাদমাখা হাসি হাসিতেছে। কিন্তু এসময়েও ভাগীরথী-বক্ষে মৃদু পবন-হিল্লোলে ক্ষুদ্র তরঙ্গাবলী চন্দ্র-মৌলি হইয়া নাচিতে নাচিতে আবেগভরে ছুটিতেছে।

এই সময় কন্দর্পপুরে এক ভগ্নপ্রায় বাঁধাঘাটে দাঁড়াইয়া একজন যুবা পুরুষ তাৎকালিক শোভারাশি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি

কখন সেই ক্রীড়াশীল তরঙ্গাবলীর প্রতি— কখনও বা অদূরস্থ কোন নৌকার ক্ষীণ দীপালোকের দিকে চাহিতেছিলেন। এমন সময় প্রভাতকালীন অর্দ্ধবিকসিত শ্বেতপদ্মের ন্যায় একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ধীরে ধীরে নদী-তটে আসিল। বসন্তের কুসুম গুচ্ছের ন্যায় তাহার দেহলতায় প্রস্ফুট-মাধুরী ক্রীড়া করিতেছে! যুবা অনিমেষ-নেত্রে সেই রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন, গঙ্গা-গর্ভ হইতে সহসা একখানি স্বর্ণপ্রতিমা উত্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল! যুবা নির্ব্বাক্,—নিস্পন্দের ন্যায় বালিকার সরলসুমধুর হাসিভরা মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন—রূপরাশিতে তাঁহার মন নিমগ্ন হইয়া গেল! বালিকা তাঁহার এই অভিনব ভাব দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এই সময় একখানি ক্ষীণ মেঘে চন্দ্রমা আবৃত হইয়াছিল—সহসা অপসৃত হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবীতে তরল-স্বচ্ছ রজত-কিরণ-ফুটিয়া উঠিল; বালিকার সেই সরল সুমধুর হাসির সহিত আপন হাস্য-রাশি মিলাইবার নিমিত্ত যেন সুধাকরও হাসিয়া উঠিল—সুতরাং, চন্দ্রের দেখাদেখি প্রকৃতিও আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলনা; তখন সমস্ত পৃথিবীতে হাস্যের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল!

বালিকা, চরণস্পর্শাভিলাষী লহরীমালার প্রতি চাহিতে চাহিতে একবার তটের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"সই!—দাঁড়া ভাই!' --

যুবার ভাব-যোগ টুটিল! তিনি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি এখনও এখানে?"—

"আমরা প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছিলাম!"—

যুবা যেন কিছু অন্যমনে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমিও বিসর্জ্জন দিতে আসিয়া পারিলাম না!"

বালিকা যেন কিছুই বুঝিল না,—অন্যমনে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।—যুবক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন!

ক্ষণকাল-পরে বালিকা ধীরে ধীরে কহিল,— "আবার চেষ্টা কর!"

কথাগুলি যেন কিছু কম্পিত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল!—যুবা তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন—"বহুবার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছিনা!"—

বালিকা এইবার আর সাম্‌লাইতে পারিলনা, জলের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আমি তবে আপনিই যাই!"—

প্রবোধ চন্দ্র হাত ধরিলেন—বলিলেন, "এবার প্রতিমার বিসর্জ্জন—নয়—সাধকের!"—

বাঁধ ভাঙ্গিল!—প্রবোধ চন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেন আর সে বালিকা নয়, এক তেজস্বিনী ষোড়শী-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা!—হেমলতা সহসা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, "বুঝিয়াছি—কিন্তু শোন,—আমি আর লজ্জা করিবনা—কেন লজ্জা করিব?—কাহার কাছে লজ্জা করিব?—তবে শোন,—এই বালিকার কথা শোন,—এ পৃথিবীতে যদি আমার কোন ভাল-বাসার সামগ্রী থাকে,—তবে সে তুমি!—এ ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র-হৃদয়ে যদি কোন মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া থাকে, তবে সে তোমার!—এ হৃদয় তোমারই—তোমারই জন্য ইহা—"

যুবা অবাক হইয়া তদীয় তেজোদীপ্ত বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—ভাবিতে লাগিলেন, "ইহা মানবী না দেবী-প্রতিমা?"—

হেমলতা তাঁহার ভাব দেখিয়া দুঃখ-গর্ব্ব মিশ্রিত-স্বরে বলিল,—

"কি ভাবিতেছ?—এখনও তোমার ভ্রম ঘুচিল না?—এইখানে কি, দেখ দেখি!"—বলিয়া নিজ বক্ষঃস্থলে হাত দিল।—

প্রবোধচন্দ্র বিস্মিত হইলেন,—পুনরায় একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল!

"দেখিলে, এখন প্রত্যয় হইল?"

যুবা স্তম্ভিত!

কূল হইতে কে ডাকিল "সই, আয় ভাই, আর দাঁড়াতে পারিনা।"

প্রবোধচন্দ্র ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "যাও,—কিন্তু আবার বলি—নিরাশা!"—

হেমলতা বুকে হাত দিয়া উপর দিকে চাহিল,—চাহিয়া কি জানি, কেন কাঁদিয়া ফেলিল,—নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল! যুবকের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সহসা বালিকার ক্ষুদ্র মুখ খানি আপনার বুকের মধ্যে লইলেন। বালিকা তাঁহার বক্ষস্থল হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া বলিল, "এখনও তোমার বিশ্বাস হইলনা?—এখনও তুমি ভাবিতেছ? তবে শোন—আজ আমি এই রাত্রিকালে,—এই প্রফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে,—এই ভাগীরথী সাক্ষাতে বলিতেছি আমি আর কাহারও নই!"

যুবক উৎফুল্ল মনে বালিকার মস্তক পুনরায় স্বীয় বক্ষে লইলেন।—উভয়েই নীরব। উপরে অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জসহ চন্দ্রমা—আর নিম্নে অনন্ত-প্রেমোন্মাদিনী ভাগীরথী—সেই অপূর্ব্ব প্রেম-মিলন দেখিতে লাগিলেন; সলিল-সংপৃক্ত সায়াহ্নপবন সেই দুটি তরুণ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রেমের অনন্ত নীরব-ভাষা শুনিতে লাগিলেন!

এই ভাবে কিছুক্ষণ গত হইল। সহসা কোথা হইতে একখানি গাঢ়-কৃষ্ণ মেঘ-খণ্ড আসিয়া চন্দ্রমণ্ডল আবৃত করিল। সঙ্গে সঙ্গে

বায়ুও প্রবল হইল। জাহ্নবী বক্ষে ক্ষুদ্র লহরীমালার স্থলে বৃহৎ তরঙ্গাবলী ছুটিল। যুবক চমকিত হইয়া মস্তক তুলিয়া বালিকার বদনমণ্ডল হস্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া প্রকৃতির এই অভিনব ভাব বিপর্য্যয় দেখাইয়া দিলেন। বালিকা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিল।

যুবা নির্ব্বাক্, নিস্পন্দভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হৃদয় মধ্যে তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল।

সহসা একটি মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; যুবা চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—শ্যামাচরণ!—

শ্যামাচরণ প্রবোধচন্দ্রের প্রতিবেশী যুবা। ইহার চরিতাবলী পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে; তবে এখানে আপাততঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, শ্যামাচরণ কন্দর্পপুরের একটি পাপাবতার! এমন কোনও অসৎ কার্য্য নাই যে, শ্যামাচরণ তাহা করিতে পশ্চাৎপদ! এক কথায় বলিতে গেলে শ্যামাচরণ একটি ভয়ঙ্কর নরপিশাচ।

শ্যামাচরণ প্রবোধচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া বিদ্রূপ স্বরে কহিল-- "গঙ্গাজলের প্রেম বড়ই পবিত্র!"

প্রবোধচন্দ্র প্রথমে একটু নীরব রহিলেন -- পরে রুক্ষস্বরে বলিলেন--"পিশাচের চক্ষে নয়!"

শ্যামাচরণ।—"তবে চোক্ দুটো একটু ধুয়ে নেই" এই বলিয়া হাসিয়া জলে নামিতে গেল।

প্রবোধচন্দ্র বিরক্ত ভাবে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। শ্যামাচরণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### প্রণয়ের বীজ।

প্রবোধচন্দ্রের বাড়ীখানি অতি বৃহৎ—অট্টালিকা বলিলেও বলা যায়। বাটীটি তিন মহল। প্রথম মহলে প্রকাণ্ড পূজার দালান। দালানের চারিদিক চক্‌বন্দী। বাটীর সম্মুখে সুনীল আকাশের ন্যায় শ্যামল শস্পদল পরিপূর্ণ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। উহার এক পার্শ্বে পূর্ব্বে পঞ্চবটী বন ছিল,—১২৭১ সালের ভীষণ বাত্যায় তাহার বৃক্ষগুলি সমস্তই সমূলোৎপাটিত হইয়াছে। কেবল একটীমাত্র অশোক তরু ধরাতলে শায়িত হইয়া যেন জ্ঞাতিগণের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছে!—দ্বিতীয় মহলটী সৌষ্ঠবশূন্য; ইহাতে গৃহাদি কিছুই নাই; কেবল উভয় পার্শ্বে কয়েকটী ঘরের ভিত্তি মাত্র দৃষ্ট, হয়। বোধ হয়, গৃহস্বামী বাটীর এই অংশটী নির্ম্মাণ করিতে

করিতে কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব কারণবশতঃ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।—ইহার পর অন্দরমহল। এই মহলটাও চকৃবন্দী। চতুর্দ্দিকে দ্বিতল গৃহ।—তাহার পর খিড়্‌কীর বাগান ও পুষ্করিণী। বাটীটি প্রবোধচন্দ্রের পিতামহ ৺কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় একমাত্র সন্তান, প্রবোধের পিতা সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। পাঠক! আজি যে বাটীকে শব্দহীন, মনুষ্য-হীন সমাধিভূমিস্থ গৃহের ন্যায় ভয়াবহ শূন্যময় দেখিতেছেন, কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা এরূপ ছিল না। তখন দাসদাসীর গণ্ডগোলে, বালক-বালিকার হাস্যরোলে, সর্ব্বদা কোলাহলময় থাকিত। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল অধিক দিন এ শোভা সহিতে পারিল না; সে অচিরাৎ প্রবোধ-চন্দ্রের পিতার এই সুখের হাট ভাঙ্গিয়া দিল,—সোনার পসরা কাড়িয়া লইল! করাল কালের পীড়নে এইরূপ কত সুখের হাট ভগ্ন হইয়াছে, কত সোনার পসরা অপহৃত হইয়াছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

প্রবোধচন্দ্রেরা তিন সহোদর ছিলেন; প্রবোধ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ দুই জনেরই বিবাহ হইয়াছিল, প্রত্যেকের দুই তিনটী করিয়া সন্তানও হইয়াছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া গণ্ডগোল করিয়া খেলা করিত; প্রবোধচন্দ্রের পিতা তাহা দেখিয়া হাস্য করিতেন এবং মনে মনে ভাবিতেন—এ সংসারে ইহাই সুখের চরম। কিন্তু হায়! শীঘ্রই তাঁহার এ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল!—নিষ্ঠুর কাল সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই এ সুখের রঙ্গশালা হইতে বহিষ্কৃত করিল এবং পরে ক্রমে ক্রমে প্রবোধচন্দ্রের উভয় সহোদর ও তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রগুলিকে পর্য্যন্ত আপনার করাল কবলে কবলিত করিল। কেবল প্রবোধচন্দ্র ও

তাঁহার জননী উৎসবগৃহের প্রভাতকালীন দুই একটী নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ দীপশিখার ন্যায় সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা মধ্যে মিট্-মিট্ করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্র তখন নিতান্ত বালক। তাঁহার জননী উপর্য্যুপরি নিদারুণ শোকতাপে একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন,—ভাবিলেন, অনাহারে জীবন পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই, তিনি মরিলে বালক প্রবোধচন্দ্রের কি দশা হইবে?—কে তাহার মুখপানে চাহিবে? —এই ভাবনা তাঁহার মনে প্রবল হইল। সুতরাং সেই ভীষণ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, তিনি প্রবোধচন্দ্রের মঙ্গলকামনায় মনোনিবেশ করিলেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, প্রবোধচন্দ্র গ্রামের নিকটস্থ একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তথাকার পাঠ সমাপন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অতঃপর কলিকাতায় গিয়া যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী পরীক্ষাতেও কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন। ইহার পরেই তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার পক্ষে এক বিষম ব্যাঘাত সংঘটিত হইল।—তাঁহার পৈতৃক যে বিষয়াদি ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দে দিনযাপন হইত। কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণের অভাবে সমস্তই বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। হয়ত কোন স্থানে দুই তিন বৎসরের খাজানা বাকী পড়িয়া আছে,—আদায় হয় না; হয়ত কোন মহলের ভূমিখণ্ড তত্রত্য জমিদার মহাপ্রভু গ্রাস করিয়া ফেলিলেন; হয়ত কোন কর্ম্মচারী খাজানার টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিয়া বসিল; এইরূপ নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধা উপস্থিত হইতে লাগিল। এই অসুবিধা দুরীকরণের জন্য, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, প্রবোধচন্দ্রকে কলিকাতার

পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইল। ইংরাজি শিক্ষাও, সুতরাং তাঁহার শেষ হইল। অতঃপর তিনি বাটী আসিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শৈশবাবধি তিনি ঐ দেবভাষার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন; বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে, তাঁহার সে ইচ্ছা সম্যক্ প্রকারে ফলবতী হইতে পারে নাই,—এক্ষণে বাটী বসিয়া বিষয়াদির তত্ত্বাবধারণ এবং হেমলতার পিতা শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শিবপ্রসাদ ঐ অঞ্চলের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় একজন বিশেষ পারদর্শী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি প্রবোধচন্দ্রকে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্রও অসামান্য বুদ্ধি প্রভাবে অচিরেই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শিবপ্রসাদ আপন তনয়ের ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতেই হেমলতার সহিত প্রবোধের প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। তখন হেমলতার বয়স দশ বৎসর মাত্র। প্রথম আবির্ভাবে এই প্রণয় পরিণামবোধশূন্য বালহৃদয়ের সরল ভালবাসা মাত্র;—শারদ-চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল; বায়ুবিক্ষোভশূন্য সরসী সলিলের ন্যায় নিষ্কম্প ও তরঙ্গবিহীন; নব প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মবৎ অকীটদষ্ট! কিন্তু ক্রমে ক্রমে, দিনে দিনে, সে কিরণে ছায়া পড়িল,—সে সলিলে তরঙ্গ ছুটিল,—সে কুসুমে কীট প্রবেশ করিল!—প্রবোধচন্দ্র পড়িতেন, হেমলতা কাছে বসিয়া শুনিত। আরও দুই তিনটী যুবা তাহার পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিত, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবোধচন্দ্রের পড়া শুনিতে তাহার বড় ভাল লাগিত। প্রবোধচন্দ্র আবৃত্তি করিতেন, বালিকা আপন বামহস্তের উপর স্বীয় ক্ষুদ্র শরীর-

ভার বিন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় একমনে শুনিত, আর সেই অনুপম মুখখানির প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত। শিবপ্রসাদ এ সকল দেখিতেন, দেখিয়া হাসিতেন। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নাই যে, সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রণয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র যূথিকাও যে তাহার সেই ক্ষুদ্রতম হৃদয়ে মধু ধারণ করে, ইহা তিনি বুঝিয়াও বুঝেন নাই।

এই সময় প্রবোধচন্দ্রের মাতা, পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। একটী বউ আসিলে তাঁহার সাংসারিক অনেক বিষয়ে সাহায্য হয়,—বিশেষতঃ, তাঁহার এই বৃদ্ধবয়সে প্রবোধচন্দ্রের ক্রোড়ে একটী সন্তান দেখিয়া মরিতে পারিলে, তাঁহার এ দগ্ধ জীবনেও একটু শান্তিলাভ হয়, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রের বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। দুই চারি স্থান হইতে সম্বন্ধও আসিল। কিন্তু বিবাহের নাম হইলেই প্রবোধচন্দ্র একটা না একটা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বসিতেন। তিনি জানিতেন যে, ইহাতে তাঁহার মাতাকে অত্যন্ত অসুখী করা হইতেছে; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে হেমলতার মোহন ছবি অলক্ষ্যে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মুছিয়া অপর কোন মূর্ত্তিকে স্থান দিতে পারিতেন না,—তিনি মনে মনে বলিতেন, "মা'র অসুখ দুই দিনের জন্য, কিন্তু আমি যে চিরজীবনের জন্য অসুখী হইব।"

বিধাতাই বলিতে পারেন, এই প্রণয়-বীজের কোথা পরিণতি!

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## স্বপ্নান্তে।

গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনদিগকে বিজয়ার যথাবিধি প্রণাম নমস্কারাদি করিয়া—প্রবোধচন্দ্র আজ অসময়ে শয্যাগত। অন্য দিন তিনি আহারান্তে মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া মাতাকে শ্রবণ করান এবং তদনন্তর আপন কক্ষে বসিয়া ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া নিদ্রা যান। আজ এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া, তাঁহার মাতা সহজেই উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু গাত্র পরীক্ষা করিয়া, অসুখের কোন লক্ষণ বোধ না হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন,—অন্যবিধ প্রশ্নের দ্বারা নিদ্রার বিঘ্ন করিলেন না।

প্রবোধচন্দ্র শয়ন করিলেন বটে,—কিন্তু নিদ্রার জন্য নহে; নির্জ্জনে নিস্তব্ধভাবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া তিনি সেই অতীত সুখ-

স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই কৌমুদী-প্লাবিত সুখ সন্ধ্যা, সেই কলনাদিনী জাহ্নবী, এবং তৎপরে সেই সুবর্ণপ্রতিমা-সদৃশ বালিকার অনুপম রূপমাধুরী ও সুধাময় হাস্যরাশি—একে একে সকলই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যেন সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য তিনি এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তৎপরে, বসন্ত সমাগমে প্রথম মলয়-মারুতহিল্লোলের ন্যায়, বালিকার সেই হৃদয়োন্মাদকর প্রণয়ালাপ মনে পড়িল,—তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল,—অন্তরে অন্তরে যেন সেই বায়ু প্রবাহ সঞ্চারিত হইতে লাগিল! পরক্ষণেই বালিকার সেই রোদন,—তাঁহার হৃদয়মধ্যে মস্তক রাখিয়া সরলা বালিকার সেই নিরাশ নিপীড়িত হৃদয়ের বাহ্য বিকাশসূচক উত্তপ্ত অশ্রুধারা—মনে হইয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না; আবার না ভাবিয়াও থাকিতে পারেন না,—হৃদয় যেন শূন্য হইয়া যায়! কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অবস্থান করিয়া পরিশেষে তাঁহার চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং অবিলম্বে নিদ্রাতুর হইলেন। কিন্তু এ নিদ্রা তাঁহার তৃপ্তিকর হইল না,—এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া তিনি নিশাশেষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

প্রবোধচন্দ্র স্বপ্নাবেশে দেখিলেন,—যেন বিমল চন্দ্র-কর-বিধৌত বাসন্তী যামিনী, সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ, সুখসেব্য বসন্ত-সমীরণে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। এমন সুখময়ী রজনীতে তিনি আর হেমলতা যেন একখানি অপূর্ব্ব তরণী আরোহণ করিয়া ভাগীরথী বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছেন। নৌকাখানি রাজহংসীর ন্যায় নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে, ধীরে ধীরে চলিতেছে। উপরে নৈশাকাশে

পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া অজস্রধারে অমৃত-কিরণ বর্ষণ করিতেছে, নিম্নে জাহ্নবী বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা আলোককণা মস্তকে করিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে! হেমলতা তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রকৃতির এই মনোমোহন ছবি অবলোকন করিতেছে এবং কত কথা বলিতেছে, তিনিও যেন উচ্ছ্বসিত সুখের তরঙ্গ হৃদয়মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না,—বিহ্বল চিত্তে বালিকার সেই সুবিমল মুখারবিন্দের প্রতি অনিমিষলোচনে চাহিয়া আছেন,— তাহার সেই মৃদুমধুর স্বর্গীয় প্রেমগান শুনিতে শুনিতে যেন আপনা-হারা হইয়া যাইতেছেন! কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এ সুখ-সম্ভোগ ফুরাইল।—কোথা হইতে নিবিড় কালমেঘ আসিয়া সহসা সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—চন্দ্র ডুবিয়া গেল,—নিমেষ মধ্যে প্রকৃতির সেই অতুল্য রূপরাশিতে ঘন কালিমাচ্ছায়া পতিত হইল। প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল,—জাহ্নবী বক্ষে ভীষণ তরঙ্গ ছুটিল,— নৌকা ডুবু ডুবু হইল,—দেখিয়া হেমলতা সভয়ে তাঁহাকে দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল;—পলকের মধ্যে নৌকাও ডুবিল।

প্রবোধচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারিলেন না,—যেন কোন মোহিনী মায়ায় তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল। আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগ্রত অবস্থায় লোকের যেরূপ অস্ফুট চৈতন্যের সঞ্চার হয়, তৎকালে তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। তিনি নিস্পন্দভাবে, মুদ্রিতনয়নে, বিস্ময়-বিমুগ্ধ মনে, ছায়াবাজির ন্যায় পুনরায় দেখিতে লাগিলেন,—যেন নৌকা ডুবিবামাত্র তাঁহারা উভয়ে সেই উন্মত্ত তরঙ্গরাজি ভেদ করিয়া সাঁতার দিতেছেন।

কিন্তু বহুক্ষণ এ সুখও ভোগ করিতে পাইলেন না,—প্রবল তুফানে তাঁহাদিগের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি হেমলতাকে আর দেখিতে পাইলেন না। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই প্রবল বায়ুতরঙ্গ তাঁহার চীৎকারধ্বনি কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল,—তিনি হেমলতার কোন উত্তর পাইলেন না।

তখন প্রবোধচন্দ্র প্রাণপণে সেই উদ্ধত তরঙ্গাবলীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ইতস্ততঃ হেমলতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার উদ্দেশ পাইলেন না। এমন সময়, একটী প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে নদীগর্ভে চাপিয়া ধরিল ; তিনি যেন কোন ঐশী শক্তির বলে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া উপরে উঠিলেন ; উঠিবামাত্র অপর এক প্রকাণ্ড তরঙ্গাঘাতে একটী ক্ষুদ্র সুরম্য দ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন।

তখন তুফান ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। সুদূর আকাশ প্রান্তে বিজলী-চমকবৎ যেন একটী অনতিস্ফুট ক্ষীণ জ্যোতিরেখা দেখা দিল। তিনি বিভ্রান্ত-নয়নে সেই আলোকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা দেখিলেন, এক যুবাপুরুষ সেই আলোকের মধ্য হইতে বহির্গত হইল এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক অপূর্ব্ব দেব-কন্যা তাহা হইতে নির্গত হইয়া যুবকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক সহাস্যে তাহার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে, সেই আলোক ও সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দম্পতী তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। তিনি নিস্পন্দ-নয়নে চাহিয়া দেখি-লেন যে, সেই দেবকন্যা তাঁহারই হেমলতা! তিনি উন্মত্তভাবে

ব্যাকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলেন,—সে শুনিতে পাইল না। তিনি অধীরচিত্তে সেই যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমার হেমলতাকে তুমি কোথায় লইয়া যাও?" যুবা তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ঈষদ্ধাস্যে হেমলতাকে লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্রমে সেই আলোক আরও সুস্পষ্ট হইল। প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার হেমলতা একখানি শুভ্র মেঘখণ্ডের উপর বসিয়া একটী পূর্ণশশী কোলে করিয়া হাসিতেছে,—কত সোহাগ করিতেছে,—তাহার রূপের বিভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়াছে! তিনি উন্মত্ত হৃদয়ে চীৎকার করিয়া আবার তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু এবারও হেমলতা শুনিতে পাইল না। দেখিতে দেখিতে সে দৃশ্য কোথা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে সেই আলোক আরও নিকটে আসিল,—আরও উজ্জ্বল হইল। প্রবোধচন্দ্র আবার চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।—দেখিলেন, তাঁহার হেমলতা ছিন্নভিন্ন বেশে, আলুলায়িত কেশে, পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—তাহার সেই অনুপম রূপরাশিতে যেন ঘোর কালিমাচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল,—তিনি উদ্ভ্রান্ত মনে উচ্চৈঃস্বরে আবার তাহাকে ডাকিলেন। এবার যেন হেমলতা শুনিতে পাইল এবং তাঁহাকে দেখিয়া বিকট চীৎকার পূর্ব্বক উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন, সে ছুটিতে ছুটিতে যে মেঘখানির উপর পা দিতেছে, তাহা হইতেই যেন অজস্রধারে বারিবর্ষণ হইতেছে। তিনি বিশেষ-

রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যেন তাহা বৃষ্টি নহে,—হেমলতার অশ্রুধারা!

হেমলতা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই বিক্ষিপ্ত মেঘমালার উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে সহসা যেন পদস্খলিত হইয়া একেবারে নিম্নস্থ নদীগর্ভে পতিত হইল। পড়িবার সময় তাহার ভয়-বিজড়িত ঘোরতম আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রবোধচন্দ্রও ভয়াবরুদ্ধকণ্ঠে অব্যক্ত চীৎকার করিয়া তাহাকে সেই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে ছুটিলেন; কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলেন যে, এক জটাজূটধারী নবীন সন্ন্যাসী সহসা কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়া, হেমলতার হস্তধারণ পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে তাহাকে তীরে উত্তোলন করিলেন। প্রবোধচন্দ্র বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, সেই সন্ন্যাসীর অবয়বের সহিত তাঁহার নিজ অবয়বের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে!

হেমলতা তীরে উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার নিকটে আসিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া, অঙ্গুলিসঙ্কেত পূর্ব্বক তাঁহাকে কি দেখাইয়া দিল। তিনি বিস্মিতনয়নে সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন,—পর্ব্বত-প্রমাণ এক ভীষণ অগ্নিস্তূপ ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে!—সর্পফণাসদৃশ তাহার ভয়ঙ্কর শিখারাশি লক্-লক্ করিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। প্রবোধচন্দ্র উহা দেখিবামাত্র, হেমলতা বিকট চীৎকার করিয়া সেই দিকে ছুটিল। প্রবোধচন্দ্রও তাহাকে ধরিবার জন্য তীরবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন; কিন্তু হেমলতা চকিতের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া সেই জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইল!—দেখিয়া প্রবোধচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

এই চীৎকারে তাঁহার মায়া-নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, রজনী প্রভাতপ্রায়,—পতিবিরহ বিধুরা কুলবতীর ন্যায় কয়েকটি মলিনমুখী তারকা বিষাদ-ভরে গগন-তলে বসিয়া আছে! জাহ্নবীর কুলু-কুলু-ধ্বনি অদূরে অস্পষ্ট ভাবে শুনা যাইতেছে,—সুস্নিগ্ধ প্রভাত-সমীর ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। তিনি উন্মত্ত-মনে গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দ্রুতপদে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার অন্তরে সেই ভীষণ স্বপ্ন এখনও যেন প্রত্যক্ষবৎ জাগিতে লাগিল!

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## মিত্র সন্নিধানে।

অন্যমনে চলিতে চলিতে প্রবোধচন্দ্র গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। দারুণ দুঃস্বপ্নবশে, সুনিদ্রার অভাবে, তাঁহার শরীর অবসন্ন,--চিত্ত স্ফূর্ত্তিবিহীন,—উষার মনোমুগ্ধকর রূপচ্ছটাও তাঁহার চিত্তবিকৃতি দূর করিতে পারিল না। তিনি উদাসপ্রাণে অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন,—তখনও দুই-চারিটি ক্ষীণ নক্ষত্র নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে; নৈশ শোভায় ক্ষীণরেখা অস্ফুট স্মৃতির ন্যায় তখনও যেন স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। সম্মুখে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী অলসগমনা তরুণীর ন্যায় প্রশান্ত মন্থর গতিতে বহিয়া যাইতেছে। নিশাবসান বুঝিয়া দুই একটি শৃগাল তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চক্-চক্ করিয়া জলপানানন্তর অদূরস্থ বন মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে অন্যমনে

প্রবোধচন্দ্র গত রজনীতে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—যেখানে তাঁহার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী সেই সুবর্ণপ্রতিমা হৃদয়ভরা হাসি হাসিয়া তাঁহার অন্তরে অমৃতরাশি সেচন করিয়াছিল—সেই খানে আসিয়া দাঁড়াই-লেন। সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে কে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল! চমকিত হইয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন—যোগেন্দ্রনাথ!

যোগেন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রের বাল্যসখা। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়ো-বিংশ বৎসর, হস্ত-পদ সুদৃঢ়. বক্ষঃ বিস্তৃত—দেখিলেই অপরিমিত বলশালী বলিয়া বোধ হয়। যোগেন্দ্র এই তরুণ বয়সে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া সদর আদালতে ওকালতী করেন। অত্যল্পকাল মধ্যে এ ক্ষেত্রেও তিনি বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন—সকলেই তাঁহাকে একজন সুদক্ষ উকীল বলিয়া জানে। সংসারে যোগেন্দ্রনাথের মাতা, সহধর্ম্মিণী ও এক কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন অপর কেহই নাই। ভগিনীর নাম সরোজকুমারী—সরোজ হেমলতার 'সই'। যোগেন্দ্রনাথ উপযুক্ত সময়ে বীরনগরের কোন সুবিখ্যাত ধনাঢ্যের গৃহে সরোজের বিবাহ দিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই যোগেন্দ্রনাথ আপনাকে সংসারের মধ্যে একজন পরম সুখী পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন।

যোগেন্দ্রনাথের অনেক গুণ। বিশেষতঃ তাঁহাকে দয়ার অবতার বলিয়া বোধ হইত। দরিদ্রের দুঃখমোচন করিতে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। যেখানে কোন বিপন্ন লোক বিপদভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যোগেন্দ্রনাথ সেই খানে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট। বস্তুতঃ, দরিদ্র-প্রতিপালন তাঁহার জীবনের একমাত্র মহাব্রত বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথের পরিবার অল্প বটে, কিন্তু তাঁহার পোষ্য অনেকগুলি। কলিকাতার বাসায় অনেক লোক,—অনেকগুলি অনাথ দরিদ্র বালক তথায় থাকিয়া লেখাপড়া করে, অনেক নিঃসহায় ভদ্রসন্তান তথায় থাকিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করে। যোগেন্দ্রনাথ তাহাদিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন, এবং কোনরূপ আধি-ব্যাধিতে স্বয়ং তাহাদিগের শুশ্রূষা করেন। যোগেন্দ্রনাথ, বাস্তবিক, অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল।

যোগেন্দ্রনাথ ওকাতলী করেন বটে, কিন্তু অর্থগৃধ্নু নহেন। কোন নিঃস্ব লোকের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে,—তাহার নিকট হইতে কিছু লওয়া দূরে থাকুক—বরং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয়ভার পর্য্যন্ত স্বয়ং বহন করেন ও তাহার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া স্বীয় পরিশ্রমের সমুচিত প্রতিদান বোধ করেন। তাঁহার অমায়িকতা ও সার্ব্বজনীন সহানুভূতি দেবতাদুর্ল্লভ বলিয়া বোধ হয়,—তাঁহার হাস্যোৎফুল্ল মুখাবলোকন করিলে হৃদয়ের দুঃখ-যাতনা দূরে চলিয়া যায়।

যোগেন্দ্রনাথ এক্ষণে পূজার অবকাশে বাটী আছেন এবং অভ্যাসমত প্রত্যূষে মুক্ত বায়ু সেবনার্থ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছেন। অদূরে প্রবোধচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া, তিনি দুই তিন বার তাঁহাকে ডাকিলেন; কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। একাকী প্রত্যূষে নদীতীরে এরূপ অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার হেতু কি জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে প্রবোধচন্দ্রের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। প্রবোধচন্দ্র চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে?—এরূপ ভাব কেন?"

যোগেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নে কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, প্রবোধচন্দ্র নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ পুনরপি কহিলেন—"চুপ করিয়া রহিলে কেন? বুঝিয়াছি, তোমার অন্তরে কোন গোপনীয় কথা রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিবে কি না ভাবিতেছ। ভাল, উহা যদি এতই গোপনীয় হয় যে, আমার সমক্ষে বলিতেও তোমার সঙ্কোচ জন্মে, তবে বলিয়া কাজ নাই—অনর্থক হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই।"

প্রবোধচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; বাল্যসুহৃদের দক্ষিণ হস্ত আপন হস্তমধ্যে লইয়া সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং এতক্ষণ বলিবার পক্ষে ইতস্ততঃ করার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, একে একে হেমলতার সহিত প্রথম প্রণয়-সঞ্চারের ঘটনা হইতে গত রজনীর সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সমস্ত শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"এই সামান্য কারণে এতদূর চিন্তিত হইবার কারণ কি? আমি অদ্যই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় ঠিক করিব।"

প্রবোধচন্দ্র নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"না, ভাই, তাঁহাকে একথা এখন বলিও না।"

যোগেন্দ্র। কেন?

প্রবোধ। বিশেষ কারণ আছে।

যো। কি কারণ, শুনিতে পাই না?

প্র। আমার সহিত হেমলতার বিবাহ দিতে অমত।

যো। কাহার অমত?—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের?

প্র। না,—তাঁহার ভগিনীর।

যো। ভাল, তাহা আমি বুঝিব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত হইলে, তাঁহার ভগিনীর অমতে কি হইবে?—ওকালতীটা এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়াছে, এখন একবার দেখিব, ঘটকালীটা করিতে পারি কি না!—আমার বিশ্বাস, উকীলেরা ওকালতীর সঙ্গে সঙ্গে ঘটকালী-ব্যবসা আরম্ভ করিলে বিলক্ষণ পসার করিতে পারে!

এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে প্রবোধচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু হেমলতার পিতার নিকট তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। বাটী গিয়াই এক পত্র পাইলেন, তদনুসারে কোন অপরিহার্য্য কার্য্যোপলক্ষে সেই দিনই তাঁহাকে বর্দ্ধমান যাত্রা করিতে হইল। গমনোপযোগী আয়োজনের ব্যস্ততা প্রযুক্ত তিনি আর প্রবোধচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## ভট্টাচার্য্যের সংসার।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কন্দর্পপুরের মধ্যে একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। বিশেষতঃ গ্রামের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা এবং কিছু কিছু ভয়ও করিত। কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার সহধর্ম্মিণী সংসারলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। পুত্রটির বয়স তখন ছয় বৎসর,—কন্যা হেমলতা তখন নয় বৎসরের। ব্রাহ্মণী হেমলতাকে বড় ভাল বাসিতেন; তাঁহার মনে কত আশা ছিল, হেমলতার বিবাহ দিয়া কত আনন্দোৎসব করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কাল অকালে তাঁহাকে সে সাধে বঞ্চিত করিল। মৃত্যুকালে সজলনয়নে তিনি স্বামি-সন্নিধানে শেষ প্রার্থনা করিয়া যান,—যেন তাঁহার

হেমা সৎপাত্রে ন্যস্ত হয়, যেন স্বামি-সুখে সে সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে।

পত্নী-বিয়োগের পর সন্তান দুইটীই ব্রাহ্মণের সংসারে অবলম্বন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগের মুখ চাহিয়া পত্নী-শোক বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু অচিরে বিধাতা তাঁহাকে সে সুখেও বঞ্চিত করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তাঁহার শিশু পুত্রটী ও ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া জননীর অনুগামী হইল। তখন হেমলতাই ব্রাহ্মণের নিদারুণ শোকাপনোদনের একমাত্র শান্তিস্থল হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ তাহাকে এক দণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না,—আহারের সময় হেমলতা নিকটে না থাকিলে তাঁহার আহারই হইত না। কন্যার মনস্তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন; সে যখন যাহা চাহিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিতেন;—হেমলতার মত ভাল ভাল পুতুল তাহার সমবয়স্কদিগের মধ্যে অপর কাহারও ছিল না। কিন্তু এত আদরের মধ্যেও তিনি তাহাকে কন্যাজনোচিত সৎশিক্ষা দিতে বিস্মৃত ছিলেন না।—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"—মহাজনোক্ত এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি কন্যাকে যথারীতি যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন এবং তাহার তীক্ষ্ণ মেধা দেখিয়া পরম পুলকিত হইতেন।

সায়ংকালে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া শিবপ্রসাদ প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন এবং জ্যোৎস্না রজনীতে কন্যা হেমলতাকে তথায় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি যখন সন্ধ্যাবন্দনাদিতে তন্ময় হইয়া থাকিতেন,

হেমলতা তখন আপন মনে বসিয়া কৌমুদীপ্লাবিত গঙ্গাবক্ষে স্বভাবের অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিত এবং তটপ্রহত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালার সহিত কত কি কলহ করিত! ধ্যানান্তে শিবপ্রসাদ কন্যার ঐরূপ ভাব দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতেন এবং হেমলতা লজ্জিতা হইয়া উত্থান পূর্ব্বক পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে এখন একমাত্র দুহিতা হেমলতা, ও এক কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নী দিগম্বরী। দিগম্বরী অল্প বয়সেই শ্বশুর-কুল নির্ম্মূল করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নীবিয়োগের পর অবধি দিগম্বরী সংসার-পর্য্যবেক্ষণের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দিগম্বরী নামেও যেমন, কাজেও তদ্রূপ—অকপট—প্রফুল্ল,—হাস্যময়ী। তাঁহার হাসির ঝঙ্কারে প্রতিবাসীর তিষ্ঠান ভার!—দিগম্বরীর এত হাসির কারণ কি, তিনিই বলিতে পারেন। তাঁহার আর এক গুণ—তিনি গল্প পাইলে আর কিছুই চাহেন না! একদা জন কয়েক প্রতিবেশিনী চক্রান্ত করিয়া দিগম্বরীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেল এবং পথমধ্যে এক গল্প আরম্ভ করিল; সঙ্গিনী সকলে গল্পের সঙ্গে স্নানাদি সমাপন করিয়া তীরে উঠিল,—দিগম্বরীর চৈতন্য নাই, তিনি অনন্যমনে অবাক্ হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া সেই গল্প শুনিতে লাগিলেন; গল্প করিতে করিতে সকলে গৃহে ফিরিল, দিগম্বরী সেই অস্নাত অবস্থাতেই তাহাদের অনুগমন করিলেন; তখন সকলে উচ্চ হাসি হাসিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গাইয়া দিল,—দিগম্বরীও সেই সঙ্গে হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেন, এবং সেই হাস্যের তুফানে কন্দর্পপুর তোলপাড় করিতে করিতে পুনশ্চ একা গিয়া

গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। এতদ্ভিন্ন দিগম্বরীর আরও একটী গুণ ছিল—তাঁহার মনোমত কাজ না হইলেই তিনি নাকে কাঁদিতে বসিতেন! শিব প্রসাদ এই নিমিত্ত তাঁহাকে দিগী পাগলী বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু তাহাতে নাকে কান্না উপশমিত না হইয়া বরং দুই চারি গ্রাম উপরে উঠিত!

দিগম্বরী অন্যথা যাহাই হউন, হেমলতাকে তিনি প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। হেমলতা যে মাতৃহীনা, তিনি তাহা এক দিন—এক মুহূর্ত্তেরও জন্য তাহাকে জানিতে দেন নাই। হেমলতার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দিগম্বরী সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু ভবিতব্যতার দুর্ল্লঙ্ঘ্য সূত্রে এক বিষয়ে তিনি অজানিত ভাবে হেমলতার আজীবন নিরানন্দের হেতু হইয়া দাঁড়াইলেন।—কন্যা বয়ঃস্থা দেখিয়া তাহার বিবাহের জন্য শিব প্রসাদ নানাস্থানে পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বংশমর্য্যাদায় বা গুণপরম্পরায় তাহার অনুরূপ পাত্র না পাওয়ায় অবশেষে প্রবোধের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। দিগম্বরীর ইহাতে সম্পূর্ণ অমত; প্রবোধের ন্যায় ঘ'রো জামাই হইলে, সাধ আহ্লাদ আমোদ প্রমোদ কিছুই হইবে না—বিশেষতঃ উহারা বড়ই 'অন্ন-ভোগী।' শিবপ্রসাদের সংকল্পিত সম্বন্ধে দিগম্বরীর অমতের শেষোক্ত হেতুটিই গুরুতর, প্রথমটি অবান্তর মাত্র। সুতরাং শিবপ্রসাদ, আপনার নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, ভগিনীর অমতে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই অন্যত্র পাত্রানুসন্ধান করিতেছিলেন।

অন্যত্র বিবাহের কথা উঠিলেই কিন্তু হেমলতা বিমর্ষ হয়। আবার আজ কয়েক দিন হইতে সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে।

তাহার সেই পূর্ব্ববৎ বালস্বভাব-সুলভ চাঞ্চল্য নাই; অধর-প্রান্তে সরল সুমধুর হাসির রেখা নাই, সঙ্গিনীদিগের নিকট পূর্ব্ববৎ গতি-বিধি নাই। সে এখন সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে, বসিয়া বসিয়া কি ভাবে,—ভাবিতে পাইলেই যেন তাহার অন্তরে আনন্দ জন্মে। সে আর এখন বহির্ব্বাটীতে যায় না; পূর্ব্বে যাহার পড়া শুনিবার জন্য সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত—এখন আর তাহার সম্মুখে বাহির হয় না; তাহার কথা উত্থাপিত হইলেই যেন সে শিহরিয়া উঠে। কেন এমন হইল?—সেই নির্ম্মল চন্দ্রকরবিধৌত সুধাময়ী যামিনীতে যাহার হৃদয়মধ্যে মস্তক রাখিয়া হেমলতা আপন হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করিয়াছিল, যাহার অন্তরে অপার্থিব সুখের অমৃতময় উৎস প্রথম প্রবাহিত করিয়াছিল, যাহাকে একবার মাত্র দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, আজ কি হেমলতা তাহাকে ভুলিতে পারিবে? তাহাও কি সম্ভবে? তবে হেমলতার এ ভাব কেন?

সেই দিন, সেই কৌমুদীপ্লাবিত রজনীতে, সেই প্রসন্নসলিলা ভাগারথীতীরে, সেই আপনা-বিস্মৃত উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রবোধচন্দ্রের সমক্ষে হেমলতা যে হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, বাটী ফিরিয়া অবধি এখন তাহার তাহাই চিন্তা হইয়াছে। সে আপনাকে কত তিরস্কার করে,—ভাবে, হয় ত প্রবোধচন্দ্র তাহাকে নির্লজ্জা বলিয়া কত ঘৃণা করিতেছেন, তাহার উপর কত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহার বাচালতার জন্য মনে মনে কত ভর্ৎসনা করিতেছেন,—ভাবে, কেন এত দুর্ব্বল হইলাম? যে বল এত দিন হৃদয় মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, কেন তাহা সহসা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম? প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া কেন দর্শন সুখের পথও রুদ্ধ করিলাম? আবার পরক্ষণেই

মনে করে, কেন, আমার দোষ কি? যাঁহার হৃদয় তাঁহারই নিকট উন্মুক্ত করিয়াছি, তাহাতে দোষ কি? অন্যের দৃষ্টিতে হয় ত দোষী হইতে পারি, কিন্তু তিনি আমাকে কখনই দোষী ভাবিবেন না।

এই রূপ নানা চিন্তায় হেমলতা দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। দিগম্বরী হেমলতার এই অবস্থান্তরের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর না পাইয়া, তাঁহার স্বভাব-সুলভ নাকে কান্না আরম্ভ করিলেন। হেমলতা চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া পিসীমার আনন্দ বর্দ্ধনে চেষ্টা করে, কিন্তু পরক্ষণেই বিমর্ষতা অলক্ষ্যে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসে।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## ঘেঁটু ঠাকুর।

বিষম সংক্রামক রোগের অত্যাচারে কন্দর্পপুর এক্ষণে নিতান্ত হতশ্রী হইলেও, গ্রামস্থ কয়েক জনের বিশেষ যত্নে তথায় আপন আপন সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ একটী সামান্য পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। কন্দর্পপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী অপর দুই একখানি গ্রামের কয়েকটী বালক তথায় শিক্ষালাভ করিত। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক গ্রামস্থ একটী যুবক তথাকার শিক্ষক। ঈশ্বর অত্যন্ত দরিদ্র; অল্প বয়সেই তাহার পিতৃবিয়োগ হয়,—তখন তাহার মাতা দুঃখ-কষ্টে গ্রামস্থ লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই কোন রূপে তাহাদিগের দিনপাত হইত। ইহা-দিগের ঈদৃশ কষ্ট দেখিয়া সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ঈশ্বরকে তথাকার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন;

সকলে ভাবিলেন, তদ্দ্বারা যাহা উপার্জ্জন হইবে, তাহাতে মাতাপুত্রের একরূপ গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে। তাঁহাদের সে আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

ঈশ্বরচন্দ্র দরিদ্রের সন্তান; কিন্তু এ অবস্থায় লোকের যেরূপ বিনয়-বিনম্র ধীর স্বভাব হওয়া আবশ্যক, ঈশ্বর তদ্বিপরীত প্রকৃতির লোক। লেখা পড়া সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বলরাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তাল-পাতের লেখা সমাপ্ত করিয়া কলাপাত ধরিয়াছিল, এবং কাঠাকালী ও ত্রৈরাশিক প্রভৃতি কয়েকটী অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিল; পরন্তু, চারুপাঠ প্রথম ভাগখানি সে এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া পড়িতে পারিত, এবং নামতাটাও তাহার আমূল কণ্ঠস্থ ছিল। তদ্ভিন্ন, সর্ব্বো-পরি, ঈশ্বরচন্দ্র কয়েক পাত ইংরাজীও পড়িয়াছিল। এই হিসাবে তাহার বিদ্যার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না!—অন্ততঃ ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ ভাবিত। সুতরাং এই বিদ্যার নেশায় তাহার স্থায় লোক যে দিশেহারা হইবে, ইহা বড় বিচিত্র নহে।

পাঠশালা হইতে "আউট" হইয়াই ঈশ্বরচন্দ্র মাথার মাঝখানে সিঁতা কাটিল এবং টেড়া মেজাজে চলিতে লাগিল; তবে অর্থাভাবে বাবুগিরির আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্য করিতে না পারায় 'মরমে মরিয়া' থাকিল। এমন সময়, গ্রামের লোকের অনুগ্রহে তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল,—ভাবনা দূর হইল,—দুঃখের পর সুখের হাসি দেখা দিল!—ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। "তক্তে" বসিয়াই সে আপনাকে "পণ্ডিত" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। যে তাহাকে উক্ত নামে অভিহিত না করিত, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সহিত কথা কহিত না।—এমন কি, কোন বালক

ভুলক্রমে তাহাকে "পণ্ডিত মহাশয়" না বলিয়া "গুরু মহাশয়" বলিলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না।

কিন্তু এত করিয়া,—"বাবু" হইয়া, নব্য যুবক সাজিয়া "পণ্ডিত মহাশয়" নাম ধারণ করিয়াও, ঈশ্বরচন্দ্র এক বিষম দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারিল না। বিধাতার বিড়ম্বনাবশতঃ বাল্যকাল হইতেই বারটী মাস তাহার সর্ব্বশরীর বিষম চুলকণা পাঁচড়ায় আচ্ছন্ন। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। এই জন্য সমবয়সীরা আদর করিয়া তাহাকে "ঘেঁটু ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত।—কোন কোন সুভাবুক "ঘেঁটু-ঠাকুর" কথাটী "কপাল-কুণ্ডলার" ন্যায় কিছু রূঢ় হয় বলিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে তাহাকে "ঘণ্টাকর্ণ" বলিয়াও অভিহিত করিত। কিন্তু প্রথম অপেক্ষাও শেষোক্ত উপাধিটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ আপত্তি ছিল; সে ইহাতে অত্যন্ত রাগ করিত এবং বক্তাকে তজ্জন্য যৎপরোনাস্তি কটুবাক্য বলিতেও কুণ্ঠিত হইত না। অবশেষে এমন হইল যে, কেহ ঘণ্টা বাদনের ন্যায় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নাড়িলেই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বলিয়া উঠিত। যাহা হউক—

"নামে কিবা আসে যায়।
যে নামে গোলাপে ডাক সম-গন্ধ তায়"।

এই কবি-বাক্যটি ঈশ্বর সম্বন্ধেও এক পক্ষে খাটে।

অন্যবিধ চরিত্র বিষয়েও ঈশ্বরচন্দ্র আপন অবস্থার বিপরীত হইয়া উঠিল। লোকেরা যে উদ্দেশে তাহাকে পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। দুই এক টাকা হাতে পাইয়াই ঈশ্বরের মন-পাখী পাখা বিস্তার করিল। অমনি

শ্যামাচরণ প্রভৃতি কতকগুলি ইয়ার আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যে ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িল। তাহার দুঃখিনী মাতার যে দুঃখ সেই দুঃখই রহিয়া গেল। ঈশ্বরচন্দ্র আজ এখানে, কাল ওখানে ইয়ারদিগের বাড়ীতে খাইয়া বেড়াইত,—যে দিন কোথাও কিছু না জুটিত সেই দিন মাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তাঁহাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিল বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব করিত। তাহার মাতা প্রত্যহ প্রতিবাসীদের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতেন, তাহাই কোনরূপে বেলা দুই প্রহরের সময় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আহার করিতেন; কিন্তু ভয়ক্রমে ঈশ্বরকে কিছু বলিতে পারিতেন না। ঈশ্বর তাঁহার একমাত্র সন্তান,—কিছু বলিলে পাছে রাগ করিয়া সে কোথাও চলিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না—এই আশঙ্কায় তিনি তাহাকে কোন কথা বলিতেন না। তিনি স্বয়ং যতই কষ্ট পান না কেন, দিনান্তে একবারমাত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেই তাঁহার পরম সুখ।

আজ ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালায় গম্ভীরভাবে বসিয়া সংস্কৃত ভাষার সপিণ্ডীকরণ করিয়া গদ্‌গদ ভাবে "চাণক্য-শ্লোক" পাঠ করিতেছে, বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময় তাহার মাতা আসিয়া সকাতরে বলিলেন,—"ঈশ্বর! আর ত পারিনা বাবা। এরূপ প্রত্যহ প্রতিবাসীদের কাছে হাত পাতিতে লজ্জা বোধ হয়! তুমি ছেলে পড়াইয়া যাহা পাও, তার অর্দ্ধেকও যদি আমাকে দাও, তাহা হইলে আমি সুখে কাল কাটাইতে পারি!"

ঈশ্বর আট দশ টাকা মাত্র উপার্জ্জন করে, ইহাতে তাহারি বাবুআনার আনুষঙ্গিক সমুদয় খরচ পত্রেরই উত্তমরূপ সংকুলান হয় না ; মাতা আবার তাহার অর্দ্ধেক ভাগ বসাইতে চাহেন—এ অন্যায় কি সহ্য হয় ? ঈশ্বরচন্দ্র জ্বলিয়া উঠিল, আরক্তনয়নে বলিল,— "যাও, যাও, আবার এখানে এসে তাক্ত করতে লাগ্‌লেন। মাতা নিতান্ত কাতর স্বরে বলিলেন,—"তা বাবা, যাই কোথা ? পোড়া মরণও ত হয়না, যে হাড় জুড়াব।

"তাহা হইলে আমিও বাঁচি, আমারও এ জ্বালা আর সহ্য হয় না।

পাপিষ্ঠের এই উত্তরে অভাগিনী জননীব চক্ষে জল আসিল তিনি চক্ষ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"আমারও যে সেই প্রার্থনা ঈশ্বর। কিন্তু পোড়া মরণ যে হয় না ? তোকে রাখিয়া যাইতে পারিলে, আমার মরণেও যে পরম সুখ। তা, তুই যদি উপযুক্ত ছেলে হইয়া আমাকে না খাইতে দিস, তবে আমি আর লোকের দ্বারে যাইব না, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।

'উপযুক্ত ছেলে হইয়া না খাইতে দিস'—এই শ্লেষবাক্যে ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল ; সে ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিল—"কি, আমি কি কিছু লেখা পড়া করিয়া দিয়াছি, যে তোমাকে খাইতে দিব ?"

ঘৃণা, লজ্জা, দুঃখে, ক্রোধে অভিমানিনী মাতা উত্তর করিলেন, —'না বাবা, তুমি দাও নি, কিন্তু তোমার বাবা, দিয়েছিলেন।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হতভাগিনী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই মর্ম্মভেদী স্পষ্ট উত্তরে ঈশ্বরচন্দ্রের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। সেই মহাগ্নি বর্ষণের উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, একটী বালক মুদিতনেত্রে মুখের অপরূপ ভঙ্গিমা করিয়া দুই হস্তে সর্ব্বশরীর চুলকাইতেছে, আর কয়েকটী বালক তাহা দেখিয়া হাসিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভাবিল, যে বালক তাহারই কার্য্যাবলীর অভিনয় করিতেছে। অমনি বীরপুরুষের ন্যায় বিষম গর্জ্জন করিয়া সে বেত্রহস্তে এক লম্ফে তাহার নিকটে যাইয়া আপনার সেই দারুণ ক্রোধের উপসংহার করিল।

এইরূপ অভিনয়কালে শ্যামাচরণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং প্রিয়-সুহৃৎকে সহসা এরূপ ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ঈশ্বরচন্দ্র মাতার সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব ঘটনা গোপন করিয়া বলিল, এই লক্ষ্মীছাড়া ছেলে গুলা গর্দ্দভ অবতার; কিছু পড়া শুনা করে না। শ্যামাচরণ হাসিয়া উত্তর করিল, "তা আর অমন করিয়া মারিলে কি হইবে? গাধা পিটিয়া যদি ঘোড়া হইত, তাহা হইলে আজ আমরা তোমায় পাইতাম না! এখন এদিকে এস দেখি, তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ আছে।"

এই বলিয়া শ্যামাচরণ ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরালে গেল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### শ্যামাচরণ।

প্রথম সাক্ষাৎকালে পাঠক মহাশয় শ্যামাচরণের সবিশেষ পরিচয় জানিতে পারেন নাই। আমাদিগের এই আখ্যায়িকার সহিত তাহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতএব, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

রামহরি মুখোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণের সহিত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতার কোন বিশেষ ঘটনাসূত্রে অত্যন্ত প্রণয় হয়। ক্রমে সেই বন্ধুতাসূত্রে আরও দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিবার জন্য হেমলতার পিতামহ রামহরিকে রাঢ়দেশের বাস উঠাইয়া কন্দর্পপুরে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করেন। একে কন্দর্প-

পুর তৎকালে সৌভাগ্যশ্রীর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে রাজধানী কলিকাতা নগরীর অতি সন্নিকটে, বিশেষতঃ সর্ব্বপাপহারিণী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে উহা অবস্থিত; প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া দেহ পবিত্র, জন্ম সফল করিতে পারিবেন ভাবিয়া রামহরি শিবপ্রসাদের পিতার প্রস্তাবে সহজেই সম্মতি প্রদান করিলেন। কন্দর্পপুরে রামহরির বাসের পক্ষে এই সময় একটা বিশেষ সুবিধাও হইয়া উঠিল। হেমলতার পিতামহের একজন জ্ঞাতি নিঃসন্তান থাকায় বাটী ঘর ও বিষয়াদি বিক্রয়পূর্ব্বক কাশী বাস করিতে সংকল্প করেন। শিবপ্রসাদের পিতা ঐ সমস্ত রামহরি মুখোপাধ্যায়ের জন্য ক্রয় করিলেন। রামহরি অচিরাৎ রাঢ়দেশের বাস উঠাইয়া সপরিবারে কন্দর্পপুরে আসিয়া ঐ বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই বাটী শিবপ্রসাদের বাটীর সংলগ্ন, এমন কি বাহির হইতে দেখিলে দুটাকে এক বলিয়া বোধ হয়। ঐ বাটীর অন্দর মহলের সহিত শিবপ্রসাদের বাটীর অন্দরমহল সমান্তরালে অবস্থিত; কেবল মধ্যস্থলে রামহরির একটা একতালা রন্ধন গৃহ উভয়কে ব্যবচ্ছেদ করিয়া রাখিয়াছে। উহার ছাদের উপর দাঁড়াইলে শিবপ্রসাদের অন্দরমহলের সমস্তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং উভয় বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা কহিবার বিশেষ সুবিধা।

শ্যামাচরণ রামহরি মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ইহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ লালমোহন কলিকাতায় কর্ম্ম করেন। যখন লালমোহনের বয়ঃক্রম বিশ এবং শ্যামাচরণের বার বৎসর, তখন তাঁহাদিগের পিতৃ-বিয়োগ হয়। সুতরাং লালমোহনকে অল্প

বয়সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া সংসার মাথায় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যেরূপ আয়, ব্যয় তদতিরিক্ত। তাঁহাকে অনেক গুলির ভরণ পোষণ করিতে হয়। সংসারে তাঁহার মাতা, স্ত্রী, সহোদর শ্যামাচরণ এবং দুইটী কনিষ্ঠা ভগিনী। যদিও লালমোহন যথাসময়ে ভগিনী দুইটার বিবাহ দিয়া এক দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের ভরণ-পোষণের দায় হইতে অব্যাহতি পান নাই। ভগিনী দুইটী বয়ঃস্থা বটে, কিন্তু তাহারা এ পর্য্যন্ত একবার ব্যতীত শ্বশুরালয় কিরূপ তাহা কখন চক্ষে দেখে নাই। ভগিনীপতিরা কোন জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে; বেতন অতি অল্প, পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা নাই, সুতরাং ভগিনী দুইটী লালমোহনের গলগ্রহ হইয়াছিল। ইহার উপর তাহাদিগের স্বভাব অতি চমৎকার: চিরকাল পিত্রালয়ে পড়িয়া থাকা তাহারা একরূপ সৌভাগ্য মনে করিত। স্বামী কষ্টে স্বষ্টে তাহাদের দুই চারি খানি মোটামুটি গহনা দিয়াছিলেন—এই গর্ব্বে তাহারা আর মাটীতে পা দিত না, —সকলের সহিত 'রগ টানিয়া' কথা কহিত; লালমোহনের স্ত্রী এই দুই জটিলা কুটিলার যন্ত্রণায় সর্ব্বদা অস্থির!

পিতৃবিয়োগের পর হইতেই লালমোহন শ্যামাচরণের লেখা পড়ার বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী হইলেন। নিজের যাহা আয় তাহাতে কোনরূপে কষ্টে-স্বষ্টে দিনপাত হয়। ভাবিলেন, শ্যাম মানুষ হইলে তাঁহার অনেক সাহায্য হইবে—সাংসারিক কষ্ট ঘুচিবে। এই ভাবিয়া তিনি কন্দর্পপুরের নিকটবর্ত্তী একটা ইংরাজী মিশনরী স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। শ্যামাচরণ প্রথম প্রথম বেশ মনোযোগের সহিত লেখা পড়া করিতেছিল—দেখিয়া লালমোহনের

সেই আশার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অচিরাৎ তাঁহার সে অঙ্কুর নিরাশার জ্বলন্ত তাপে শুখাইয়া গেল! শ্যামাচরণের যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহার মন ততই উড়ু উড়ু করিতে লাগিল! দিন দিন তাহার বাবুগিরির 'সখ' বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—লেখা পড়া সুতরাং এক প্রকার বন্ধ হইল। শ্যামাচরণ স্কুলে যাইত মাত্র, কিন্তু ক্লাসে বসিয়া মৃদুস্বরে টপ্পা গাহিত, কখন বা সমশ্রেণীর কয়েকটী "বাস্তু"—ছেলের সহিত মিলিয়া স্কুল হইতে বহির্গত হইয়া মাঠে বসিয়া তাস খেলিত!—এই সময়ে সে ইয়ারকির প্রধান সহচর তামাক খাইতেও শিক্ষা করিল।

স্কুলে এক জন পাদরী সাহেব ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কয়েকটা শ্রেণীতে বাইবেল পড়াইতেন। তাঁহার অন্যান্য উপদেশের মধ্যে তিনি বলিতেন, "তোমরা সকলের সহিত প্রেম কর, ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করিবেন।" এখন এই "প্রেম করার" প্রকৃত অর্থ শ্যামাচরণই সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিল। স্কুলে যাইবার পথে একজন বৈষ্ণবীর একটা "বাদরী" ছিল, শ্যামাচরণ সর্ব্বপ্রথমে তাহার সহিত "প্রেম" করিয়া ফেলিল! পাদরী সাহেব যে প্রেম শিক্ষা দিতেন, তাহাতে অর্থের আবশ্যকতা ছিল না; কিন্তু শ্যামাচরণের এই নূতন "প্রেমে" পয়সার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিল। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাতার নিকট কিছু চাহিতে লাগিল। শ্যাম একে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—তাহাতে আবার অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছে, সুতরাং তাহার সকল প্রকার আব্দারই তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। এই ভাবিয়া মাতা সংসার খরচ হইতে অতিকষ্টে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তাহাকে দিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি

স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার আদরের .ধন কিরূপ সৎ-কার্য্যে এই অর্থ ব্যয় করিতেছে!

শ্যামাচরণের এই "প্রেমের" কথা তাহার সমবয়সীরা সকলেই জানিতে পারিল এবং ক্রমে ক্রমে লালমোহনের কর্ণেও উঠিল। কিন্তু তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া শ্যামকে সে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া গ্রামের অপর প্রান্তে কিছু দূরবর্ত্তী অন্য একটি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এ বিষয়ের জন্য শ্যামাচরণ কিংবা অন্য কাহাকে কিছু না বলিবার অনেক কারণ ছিল। একবার তিনি লেখা পড়া সম্বন্ধে শ্যামকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন, তাহাতে তাহার মাতা বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে, "শ্যামের জন্য কাহারও ভাবিতে হইবে না; সে আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান,—কখনই কষ্ট পাইবে না, বিশেষতঃ তার কপালে 'রাজদণ্ড' আছে।' লালমোহন তদবধি আর শ্যামাচরণকে কিছু বলিতেন না। এ দিকে মাতার মুখে আপনার সু-লক্ষণের কথা শুনিয়া শ্যামাচরণ আরও যেন "দিগ্বিজপদ" পাইল,—ভাবিল, সে লেখা পড়া করুক আর না করুক, নিশ্চয়ই একটা "বড়লোক" হইবে। সুতরাং অধঃপথে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইল।

লালমোহন শ্যামাচরণকে পূর্ব্ব স্কুল হইতে ছাড়াইয়া অন্যত্র ভর্ত্তি করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। শ্যামা-চরণের অস্থি-মজ্জায় তখন "প্রেমের" তরঙ্গ বহিতেছিল, সুতরাং অচিরাৎ সে আর একটা "প্রেমপাত্রী" সংগ্রহ করিয়া লইল। লাল মোহন এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে উপায়ান্তর স্বরূপ পরিবারাদি লইয়া কলিকাতায় গিয়া বাসা করিয়া থাকেন,

এবং সেখানে শ্যামাচরণকে একটা স্কুলে পড়িতে দিয়া সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন,—ভাবিলেন, এইবার তাহার চরিত্র সংশোধন হইবে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তিনি তাহার সে ভ্রমও বুঝিতে পারিলেন; শ্যামাচরণ কতকগুলি অসচ্চরিত্র যুবকের সংসর্গে মিশিয়া এমন এক কাজ করিয়া ফেলিল, যে তাহাতে লালমোহনের পর্য্যন্ত জনসমাজে মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল।—পরিশেষে তিনি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাহাকে কন্দর্পপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই সময় তাঁহার কিছু বেতন বৃদ্ধি হওয়ায়, একটা দূরসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা বিধবাকে বাটীতে আনাইয়া রাখিলেন ও শ্যামাচরণ এবং বৃদ্ধার মাসিক প্রয়োজনীয় খরচের জন্য কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি শ্যামকে আর এক পয়সাও দিতেন না; ভাবিলেন, এরূপ কষ্টে পড়িলে তাহার চৈতন্য হইবে, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না।

শ্যামাচরণ বাটীতে আসিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া একেবারে যেন কু-কর্ম্মের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল। কলে কৌশলে গ্রামের দুই একটা নিঃসহায়া দুঃখিনী বালবিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাকে “রসিক” বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল! দিন দিন প্রকাণ্ড “শণ্ডা” হইয়া উঠিল। গ্রামের প্রান্তভাগে কয়েক ঘর বাগ্‌দীর বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাসী বাগ্‌দী নামে একজন লাঠিয়ালের নিকট শ্যামাচরণ দিন কয়েক লাঠিখেলা শিক্ষা করিল, এবং কাহারও সহিত কলহ হইলে, যখন দেখিত যে তাহার সহিত বলে পারিয়া উঠিবে না, তখন “জানিস্, আমি লাঠিয়াল সন্ন্যাসী বাগ্‌দীর সাকরেদ”, বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইত।

শ্যামাচরণের ৺ গুরুদেবের নামের অগ্রে "লাঠিয়াল" শব্দটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল। আজকাল যেরূপ "গবেশ-চন্দ্র গাড়া", "হবেশকৃষ্ট হোড়" প্রভৃতি নামের অগ্রে "রায় বাহাদুর" "রাজা বাহাদুর" প্রভৃতি অপূর্ব্ব উপাধিমালা সন্নিবিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব শ্রুতিমধুর হইয়াছে,—গৌরবের ধূমে দশদিক অন্ধকারময় হইতেছে, শ্যামাচরণ সেইরূপ, তাহার গুরুদেবের নামের অগ্রে "লাঠিয়াল" উপাধি সংযোগ করিয়া পরম গৌরব বোধ করিত।

সব হইল, কিন্তু পয়সার অভাবে শ্যামাচরণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম চালাকি অর্থাৎ জুয়াচুরি করিয়া গ্রামের লোকের নিকট যাহা সংগ্রহ করিত, তাহাতে এক প্রকার চলিত, কিন্তু আর সে সড়পায়ে ? চলে না।—শ্যামাচরণ বিশেষ ভাবনায় পড়িল,—অবশেষে এক উপায় স্থির করিল,—আজকাল নাটক লিখিলে বেশ দু-পয়সা লাভ আছে, বই ভাল হউক মন্দ হউক, "নাটক" হইলেই তাহা বিক্রয়ের ভাবনা নাই,—এই ভাবিয়া নাটক লিখিয়া শ্যামাচরণ অর্থ কষ্ট দূর করিতে সংকল্প করিল।—কিন্তু প্রথমেই এক ভাবনা উপস্থিত হইল, নাটকখানির কি নাম হইবে? "লীলাবতী", "প্রভাবতী," "পদ্মাবতী", প্রভৃতি ভাল ভাল নাম গুলি ত সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে,—শ্যামাচরণ অত্যন্ত বিরক্ত হইল, তাহার জন্য একটাও ভাল নাম রাখা হয় নাই বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে শত অভিশাপ প্রদান করিল!—যাহা হউক, তিন চারি দিন গভীর চিন্তার পর একটা নাম তাহার মনোনীত হইল,—"জয়-জগদম্বা!" অর্থাৎ নায়কের নাম জয়চন্দ্র,—জয়-গোবিন্দ,—জয়পাল, কি এমনি একটা কিছু! আর নায়িকার

নাম "জগদম্বা!"—শ্যামাচরণ নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল; তিন চারি মাস ভূতগত পরিশ্রমের পর প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, পর্য্যন্ত লেখা হইল। কিন্তু কি যে লিখিল, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বশতঃ বলিতে পারি না, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তবে দুই একটী মুখ সবক-সমালোচকের মুখে শুনা গিয়াছিল যে, "শ্যামাচরণের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার একটা মহৎ উপকার সাধিত হইল,—এতদিনের পর বটতলার বাগ্‌দেবীর পিণ্ডদান হইল;—আর কাহারও ঘাড়ে চাপিবার ভয় নাই!" কার্য্যতঃও তাহাই হইল বটে,—শ্যামাচরণের কল্পনাদেবী সহসা পাখা বিস্তার করিয়া কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন! তাহার গ্রন্থখানির ঐখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল!

কিন্তু এই সময়ে শ্যামাচরণের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। গ্রামের কোন নিঃসহায়া বিধবার কিছু অর্থ ও বিষয়াদি ছিল, একমাত্র অপোগণ্ড শিশু ব্যতীত তাহার আর কোন অভিভাবক ছিল না। সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া গ্রামের কতকগুলি কুচক্রী লোক পরামর্শ করিয়া বিধবার বিষয়গুলি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিল। বিধবা অত্যন্ত বিপদে পড়িল, এমন একটা লোক পাইল না যে, তাহার হইয়া মোকর্দ্দমা করিয়া তাহার সেই অনাথ বালকের বিষয় রক্ষা করে। এই সুযোগ বুঝিয়া শ্যামাচরণ এ সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত করিব বলিয়া তাঁহার নিকট অত্যন্ত আত্মীয়তা দেখাইল। ইতিমধ্যে শ্যামাচরণ কয়েকবার জুয়াচুরী ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া, কখন বেত খাইয়া, কখন হাজত ভোগ করিয়া, কখন বা কায়ক্লেশে নিষ্কৃতি পাইয়া, গ্রামের ইতর লোক ও স্ত্রীলোকদিগের নিকট বিষম 'মোকদ্দমা-

বাজ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল ; সুতরাং উক্ত বিপন্না বিধবা সহসা তাহার চাতুরী-জালে পতিত হইল ! শ্যামাচরণ অচিরাৎ কৌশলক্রমে তাহার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া "গা'ঢাকা" দিল !— অনাথা সর্ব্বস্বান্ত হইল।

এই টাকা পাইয়া শ্যামাচরণ দিন কয়েক খুবই বাবুয়ানা করিতে লাগিল। তাহার প্রতাপের নিকট দাঁড়ায় কাহার সাধ্য ? আজ অমুকের জমিদারী, কাল অমুকের তালুক ক্রয় করিতে যায় ! গ্রামের লোক তাহার কার্য্য দেখিয়া অবাক্ ! শেষে শ্যামাচরণ রটাইয়া দিল, যে, সে শ্যামনগরের সুবৃহৎ জমিদারী খানি আপন নামে ক্রয় করিয়াছে। লোকের মনে এই প্রসঙ্গ বিষয়ক দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনের পক্ষে বিধিমত চেষ্টারও ক্রটী ছিল না। এক দিন ইয়ার সঙ্গে শ্যাম কোন দূরগ্রামে আপন নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়াছিল ; পর দিন বেলা এগারটার সময় ছিন্ন ভিন্ন বেশে এক হাঁটু ধূলা মাখিয়া গ্রামে উপস্থিত। এক ব্যক্তি তাহার এই অভিনব বেশ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাওয়া হইয়াছিল ?" শ্যামাচরণ তাহার প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "তালুকে"। লোকটী শুনিয়া একটু হাসিল : সে শ্যামকে ভালরূপ চিনিত।

এই সময় হেমলতার রূপরাশি প্রফুল্ল শতদলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছিল ; তদ্দর্শনে হেমলতা লাভের প্রবল বাসনা তাহার মনে উদিত হইল। মনের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া সে এক দিন শিবপ্রসাদের নিকট আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিল। শিবপ্রসাদ শ্যামের অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাসিয়া কহিলেন,

"বাপু! আমার মেয়ে তোমার উপযুক্ত পাত্রী নয়, তোমার গুরু-দেবের পাড়ায় তোমার অনুরূপ অনেক কন্যা আছে।" এই বলিয়া শ্যামকে আরও কয়েটা সুমিষ্ট ভৎ সনা করিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহার এই ভৎসনা বাক্যে, এই রূঢ় ব্যবহারে অত্যন্ত রুষ্ট হইল; কিন্তু মনে মনে—"তুফানে পতিত তবু ছাড়িবনা হা'ল!"—এই প্রবাদ-বাক্য স্মরণ করিয়া হেমলতা-লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলনা।

আজ আবার শ্যামাচরণ তাহার প্রধান ইয়ার ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কি পরামর্শ করিতে আসিয়াছে জানিনা। দুই জনে অনেকক্ষণ পরামর্শ করিল, শেষে শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে, "কার্য্য সফল করিতে পারিলে বিলক্ষণ পুরস্কার পাইবে" এই আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিল।

ঈশ্বরও "দেখি, আমার হাত-যশঃ, আর তোমার কপাল," বলিয়া হাসিতে হাসিতে আপন 'তক্তে' আসিয়া বসিল।

# নবম পরিচ্ছেদ।

## ঘটক বিদায়।

প্রাতঃকালে শিবপ্রসাদ একাকী বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আছেন। আজি কোন ছাত্র পড়িতে আসে নাই। তিনি স্থিরভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। হেমলতা বয়ঃস্থা হইয়াছে, আর অনূঢ়া রাখা ভাল দেখায় না;—অনেক স্থানে পাত্র-অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোন খানে সুবিধা হইতেছে না;—এদিকে দিগম্বরী হেমের বিবাহের জন্য অত্যন্ত বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে— তিনি কি করিবেন, কিরূপে এই বিষম দায় হইতে উদ্ধার পাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। প্রবোধচন্দ্রের সহিত হেমের বিবাহ দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু দিগম্বরী তাঁহাতে একেবারে অসম্মত। এ সম্বন্ধে কথা হইলেই দিগম্বরী নাকে কাঁদিয়া একেবারে কাণের পোকা বাহির করিয়া দেন!

সুতরাং তিনি সেই ভয়ে আর সাহস করিয়া সে কথা মুখে আনিতে পারেন না। বারাসতে যে পাত্রটীর সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, অনেক দিন হইল তাহারও কোন সংবাদ নাই।—পরমেশ্বর! এমন বিপদেও মনুষ্য পড়ে?

শিবপ্রসাদ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক গুরু-গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, কি মনে ক'রে?"

ঈশ্বরচন্দ্র যেন কিছু থতমত খাইয়া "আজ্ঞে এই" বলিয়া চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া অপূর্ব্ব মুখভঙ্গিসহকারে 'ঘস্-ঘস্' করিয়া সর্ব্বাঙ্গ চুল্‌কাইতে লাগিল। শিবপ্রসাদ অবাক্ হইয়া তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবৎ তুমুল সংগ্রাম করিয়া রক্তাক্ত কলেবর হইল; কিন্তু তথাপি বিজয় লাভ করিতে পারিল না; শরীরের বস্ত্রাবৃত অংশের চতুর্দ্দিক হইতে দুর্গমধ্যস্থ রণোন্মত্ত সেনাসমূহের ন্যায় চুলকণারাজি একেবারে 'চিড়-বিড়' করিয়া উঠিল! "ঘেঁটু ঠাকুর" তাহাদিগের বিশেষ দমনের জন্য দুই তিন বার হস্ত প্রসারণ করিল; কিন্তু, দ্রুপদাত্মজকে সম্মুখীন দেখিলে ভয়ে ভীষ্মদেব যেমন জড় শড় হইতেন, শিবপ্রসাদকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্রও তদ্রূপ মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া, অতি কাতর নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বারবার সেই স্থানে হাত বুলাইতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "যাও, অতঃপর যাহা বাকী রহিল, বাহির হইতে সারিয়া আইস।"

ঈশ্বর কিছু অপ্রতিভ হইয়া “আজ্ঞে না হ’য়েছে, আজ্ঞে না হ’য়েছে,” বলিয়া বসিয়া পড়িল। পরে কিছুক্ষণ একথা ওকথা কহিয়া শেষে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিবার সূত্রপাত করিল। প্রথমতঃ নানাপ্রকারে শ্যামাচরণের গুণ বর্ণনা করিল, এবং পরে শ্যামাচরণ যে স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, ও তৎসাহায্যে সম্প্রতি একখানি সুবৃহৎ জমীদারী ক্রয় করিয়াছে, এ কথাগুলি বলিতেও বিস্মৃত হইল না। শিবপ্রসাদ তাহার কথার ভাবে আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কতদূর দৌড় দেখিবার জন্য প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সুহৃদ্বর শ্যামাচরণের গুণবর্ণনা করিয়া শেষে হেমলতার কথা পাড়িল। তাহার ন্যায় সুশীলা, সুরূপা কন্যা সৎপাত্রে ন্যস্তা হইলে যে সকলেই পরম সুখী হয়, একথাও বার বার বলিতে ভুলিল না এবং শ্যামাচরণই যে হেমের অনুরূপ পাত্র ইহাও শিবপ্রসাদকে ক্রমে আভাসে বুঝাইয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত তাহার সহিত শ্যামাচরণের গোপনে পরামর্শ এই সম্বন্ধেই হইয়াছিল। শ্যামাচরণ হেমলতার রূপরাশিতে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, বার বার শিবপ্রসাদ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও হেমলতা-প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মূর্খ পুনরায় হেমলতা লাভে কৃতসংকল্প হইল; কিন্তু এবার আর নিজে না যাইয়া প্রিয় সুহৃদ্ ঈশ্বরচন্দ্রকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিবার মানস করিল। ইহার দুই উদ্দেশ্য -- এক, সে এখন বড় লোক হইয়াছে, নিজে যাইয়া নিজের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে আপন মর্য্যাদা বিনষ্ট হইবে; দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতি গ্রামের

লোকের, বিশেষতঃ শিবপ্রসাদের যেরূপ আস্থা তাহাতে যদি কিছু বিপরীত ফল হয়, তবে তাহা পরের উপর দিয়াই যাইবে। এই সমস্ত ভাবিয়া শ্যামাচরণ ঈশ্বরের নিকট আসিয়া সমস্ত কথা বিবৃত করিয়াছিল এবং যদি তাহাকর্ত্তৃক একার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাকে বিলক্ষণ পুরস্কৃত করিবে এ কথাও বলিতে ভুলে না। ঈশ্বর একেবারে গলিয়া গেল,—বলিল, "তার জন্য চিন্তা কি? আমি এইক্ষণেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যাইয়া সমস্ত বলিব, তিনি আমার কথা কখনই লঙ্ঘন করিবেন না।"

ঈশ্বরের এরূপ সাহসের কারণ এই যে, সে মনে করিত—সে গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত এবং শিবপ্রসাদও পণ্ডিতলোক। পণ্ডিতের কথা, পণ্ডিতের উপরোধ, পণ্ডিত কখনই অবহেলা করিতে পারিবেন না! নির্ব্বোধ এই সাহসে নির্ভর করিয়া সেই উদ্দেশে হেমলতার পিতার নিকট উপস্থিত!

শিবপ্রসাদ সমস্ত শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে "আমিও এই কথা ভাবিতেছিলাম,—শ্যামের ন্যায় সৎপাত্রে কন্যা দান করা ত বিশেষ শ্লাঘার বিষয়, তাহাতে আবার তুমি যখন তাহার পক্ষে "ঘটক" হইয়া আসিয়াছ, তখন ত আর কথাই নাই। তা দেখ, আমাদের পূর্ব্বাপর নিয়ম আছে, বিবাহের অগ্রেই "ঘটক বিদায়" করিয়া থাকি;—এখন সমস্তই যখন ঠিক হইল, তখন সেই কাজটা হইয়া যাউক; পরে সময় মত বিবাহ দেওয়া যাইবে!" এই বলিয়া শিবপ্রসাদ আপন চর্ম্ম-পাদুকার দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন। ঘেঁটু ঠাকুর বন্দোবস্ত বুঝিয়া "আজ্ঞে না আমি"—"আজ্ঞে না আমি" বলিতে বলিতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়!—শিবপ্রসাদ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া

বলিলেন, ' আরে! না, না, ঘটক ঠাকুর, রাগ ক'র না বিদেয় নিয়ে যাও!"—বলিয়া হস্তস্থিত চটি জুতা খানি "বোঁ" করিয়া ছাড়িয়া দিলেন!

ঘটক ঠাকুর মাথা ঝাড়িতে ঝাড়িতে একেবারে অদৃশ্য!

# দশম পরিচ্ছেদ।

## তারাচাঁদ।

বিচিত্র বিধানে ঘটক বিদায়ের পর শিবপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। বসিয়া একখানি পুঁথি লইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় মাথায় একখানি গামছা, বগলে একটা শত ছিদ্রযুক্ত জীর্ণ ছাতা, কোমরে একখানি ময়লা চাদর জড়ান, পায়ে এক যোড়া শত তালিযুক্ত চটি জুতা, হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলামাখা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকৃতি একটা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল! ইহার নাম তারাচাঁদ। পাঠক মহাশয়ের সহিত তারাচাঁদের এই প্রথম সাক্ষাৎ; সুতরাং এ স্থলে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম।

ইহার নাম "কালাচাঁদ" না হইয়া "তারাচাঁদ' কেন হইল, সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে; "তবে ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদি-

সম্ভব যে, পাছে আঁধারে আঁধার মিশাইয়া যায়, এই ভয়ে তাহার পিতা এই মেঘঢাকা অমাবস্যা-রাত্রিতে দু'টী জ্যোৎস্নাপোকা জ্বালাইয়া লোকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন! কন্দর্পপুরের নিকটবর্ত্তী গোস্বামী গ্রামে তারাচাঁদের বাস। তারাচাঁদ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পৌরোহিত্য করিয়া এবং সময়ে সময়ে ভদ্রলোকদিগের বিবাহের ঘটকালি করিয়া দুঃখে কষ্টে সংসার চালান। তাঁহার পোষ্য অনেকগুলি, বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি মা ষষ্ঠীর অসামান্য কৃপা!

তাঁহার ব্রাহ্মণী প্রথমে কন্যা প্রসবে মনোযোগিনী হন,—তাঁহার প্রথম কন্যার নাম "লক্ষ্মী" সম্বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে "লক্ষ্মীদেবী" একটি সঙ্গিনী ডাকিয়া আনিলেন—তারাচাঁদ তাহার নাম রাখিলেন "আর্ণা"—( আর না ? ) কিন্তু সে কথা কে শোনে,—বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণী আবার এক কন্যা প্রসব করিলেন!—এই রূপে "লক্ষ্মী" হইতে "আর্ণা" "ক্ষমা", "রক্ষে", "ক্ষান্ত" "বারুণা"—( বারণ ? ) প্রভৃতি ছয় কন্যা তারাচাঁদকে উপঢৌকন দিয়া ব্রাহ্মণী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন!—এই সময় তারাচাঁদ কোন বড় লোকের ঠাকুর বাড়ীতে পূজারী নিযুক্ত ছিলেন—বিরক্ত হইয়া তিনিও তৎকর্ম্মে ইস্তফা দিলেন—ব্রাহ্মণীও কন্যাপক্ষে "ইস্তফা" দান করিলেন!

এতদ্ব্যতীত তারাচাঁদের পুত্র সন্তানও অনেকগুলি! সময় বিশেষে তাহাদিগের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইতে পারে।

শিবপ্রসাদ হেমলতার বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধানে এই তারাচাঁদকেই নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বদা কন্দর্পপুর আগমন পক্ষে তারাচাঁদের এক বিষম ব্যাঘাত,—তাঁহাকে দেখিলেই বালকেরা চারিদিক হইতে "দুর্গা" "দুর্গা" করিয়া পিছনে লাগে; তারাচাঁদ

তাঁহাতে বড়ই বিরক্ত হয়েন। "দুর্গা" নাম করিলেই কেন যে তিনি এত ক্ষেপিয়া উঠেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। একবার তারাচাঁদ তাঁহার শ্বশুরালয় বসন্তপুরে গিয়াছিলেন; তখন তাঁহার সবে একটী মাত্র সন্তান হইয়াছে; তিনি রাত্রিকালে নির্দ্দিষ্ট শয়নগৃহে স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় উত্তমরূপ বেশ-ভূষা করিয়া গজেন্দ্রগমনে স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তারাচাঁদ তাঁহার এই অপরূপ রূপ দেখিয়া কিছু রসিকতা সহকারে অভ্যর্থনা করিতে হইবে ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আহা! মরি, মরি! যেন মা দুর্গা এলেন!"—তারাচাঁদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাঁহার এই স্তুতিপাঠে—এই উদ্বোধন মন্ত্রে—শক্তিরূপিণী সন্তুষ্টা না হইয়া বরং একে বারে করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুবৃহৎ শতমুখী দ্বারা তারাচাঁদকে বিলক্ষণ প্রত্যভিবাদন করিলেন। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল এবং নানা প্রকারে স্তব স্তুতি করিয়া মহাশক্তিকে সেই ভীষণ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিলেন! সেই দিন হইতে তারাচাঁদ দুর্গানামের উপর এতদূর চটিলেন যে, কোন স্থানে যাত্রাকালেও সে নাম মুখে আনিতেন না,—তৎপরিবর্ত্তে "সিংহ-বাহিনী" নাম স্মরণ করিতেন।

কন্দর্পপুরের সুবিখ্যাত শ্যামা ঠাকুরাণীর পিত্রালয় বসন্তপুরে। শ্যামাঠাকুরাণী অবশ্যই বিধবা; কন্দর্পপুরে ইহার প্রতাপ অসামান্য। 'শ্যামা' নামটী যেমন রূপে, গুণেও সেই প্রকার। কলহ কালে ইহার কণ্ঠে যেন সহস্র বাগ্‌দেবী আবির্ভূতা হয়েন,—পরনিন্দায় ইনি বাসুকী রূপ ধারণ করেন! সুতরাং কন্দর্পপুরের মেয়ে-মহলে ইহার সর্ব্ব প্রধান আসন। শ্যামাঠাকুরাণী পিত্রালয় হইতে তারাচাঁদের এই

"ব্রত-কথা" শুনিয়া আসিয়া কন্দর্পপুরের নারী-সমাজে প্রচার করেন, এবং তথা হইতে আরও কিঞ্চিৎ সুরঞ্জিত হইয়া বালক-মহলে তাহা বিঘোষিত হয়। তাহারা তারাচাঁদকে দেখিলেই চতুর্দ্দিক হইতে "দুর্গা" "দুর্গা" বলিয়া পাগল করে। তবে তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহার নিজ গ্রামের বালকেরা তত পিছনে লাগেনা; তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে তথাকার বাস উঠাইতে হইত। তারাচাঁদ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, কদাচ কন্দর্পপুরে আসিতেন না; তাহাতেও আবার সময় বুঝিতেন; যখন দেখিতেন যে, বালকেরা পাঠশালায় আছে, তিনি সেই সুবিধামতে কন্দর্পপুরে আসিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতেন। সুতরাং আজ তাহাকে প্রাতঃকালে "দুর্গা" নাম শুনিয়া সেই বহুকালের নিগ্রহ-নির্যাতন স্মরণ করিতে হয় নাই।

তারাচাঁদ আসিবামাত্র শিবপ্রসাদ বলিলেন, "কি হে! আমি এই মাত্র তোমার কথা ভাবিতেছিলাম। তবে, সংবাদ কি বল দেখি,—বারাসতে গিয়াছিলে?"

"গিয়াছিলাম।"

"কি হইল?"

"হইল না, তাহার অন্যত্র সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছে।"

"তবে উপায়? আর কি কোথাও তোমার সন্ধানে সুপাত্র নাই?"

"কৈ, দেখিতে ত পাই না, আমি ত সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। প্রায় আট দশ দিন বাড়ী ছাড়া; কেবল আপনার জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু কোন স্থানেই আপনার মনোমত পাত্রের সন্ধান পাইলাম না। যে দুই একটি সন্ধানে ছিল, তাহা

হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এদিকে আবার ঘরে না থাকিলে চলে না; সংসারের সম্পূর্ণ অনটন—পরিবারের সমূহ কষ্ট।"

শিবপ্রসাদ তারাচাঁদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"ভাল, তাহার জন্য ভাবনা নাই; তোমার পরিবারের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তাহার উপায় করিতেছি।"

তারাচাঁদ এতক্ষণ কিছু গম্ভীর ভাবে কথা কহিতেছিলেন। শিবপ্রসাদের এই আশ্বাসে হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে তাহারা ত আপনারই প্রতিপাল্য; আপনার অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করে; তাহা না হইলে কি আমি আর কাহারও জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করি?"

শিবপ্রসাদ মনে মনে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ভাল, আর কি তোমার সন্ধানে কোন পাত্র নাই?"

তারাচাঁদ হর্ষগদ্‌গদস্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ্ঞে, তারাচাঁদের সন্ধানে পাত্র নাই, এও কি সম্ভব? আর একটা অতি উত্তম—ঠিক আপনি যেরূপ চাহেন, সেইরূপ—সুপাত্র আছে।"

"কোথা?"

"বীরনগরে। রূপে গুণে, ধনে মানে, সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট।"

"ভাল, অদ্যই তাহার সন্ধানে যাও।" এই বলিয়া শিবপ্রসাদ বাটীর মধ্য হইতে কয়েকটী টাকা আনিয়া তারাচাঁদের হস্তে দিলেন। তারাচাঁদ মহা সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## দিগম্বরীর নৃত্য।

একে একে দুইবার ঘটক বিদায় করিয়া শিবপ্রসাদ সম্মুখস্থ পুঁথিখানি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অধিকক্ষণ পড়িতে পাইলেন না,—সহসা সম্মুখে তৃতীয় এক ঘটক সমুপস্থিত! শিবপ্রসাদ মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—যোগেন্দ্রনাথ।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যোগেন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রের মুখে হেমলতার সহিত তদীয় প্রণয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরে পরিণয়সূত্র সংবদ্ধ হয়, তজ্জন্য হেমলতার পিতার নিকট আসিয়া বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া কল্পনা করেন; কিন্তু সহসা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইতে হয় বলিয়া, এবং তথায় সম্ভবাতিরিক্ত কালবিলম্ব ঘটায়

এত দিন সে চেষ্টা করা হয় নাই। গত রজনীতে তিনি বাটী আসিয়াছেন এবং আজ প্রাতঃকালেই সেই সংকল্পিত কার্য্য সাধনের উদ্দেশে শিবপ্রসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

শিবপ্রসাদ যোগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক বসাইলেন। পরে উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তার পর হেমলতার বিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠিল। যোগেন্দ্রনাথ সুযোগ পাইলেন এবং ক্রমে ক্রমে কথা-প্রসঙ্গে হেমলতার সহিত প্রবোধচন্দ্রের প্রণয়-বৃত্তান্ত আভাসে অথচ সুস্পষ্টরূপে অতি চতুরতার সহিত শিবপ্রসাদকে আমূল জ্ঞাত করাইলেন এবং উভয়ের মধ্যে পরিণয়-সূত্র সংবদ্ধ হইলে যে উভয়েই পরম সুখী হয়, সে কথাও বলিতে ভুলিলেন না। শিবপ্রসাদ ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন; কিন্তু এই প্রণয়ের কথা শুনিয়া হাসিলেন; ভাবিলেন, "বালিকার আবার প্রণয় কি?" যাহাহউক, স্পষ্টতঃ সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, যে প্রবোধের সহিত হেমের বিবাহ দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা; তিনি ইহাতে পরম সুখীও হন; কিন্তু ইহাতে দিগম্বরীর সম্পূর্ণ অমত। তিনি এই জন্য তাহাতে অগ্রসর হইতে পারেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন. "আপনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে বোধ হয় তাঁহার মত হইতে পারে।"

"অনেক বলিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। ভাল, আবার দেখিব, কিন্তু, ভরসা নাই।"

"আপনি একটু ভাল করিয়া বলিলে এবং একটু জিদ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন। তিনি আমাকেও বিশেষ স্নেহ করেন,—আমিও এজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিব। আর তাঁহার

অসম্মতির কারণ ত কিছুই দেখিতে পাই না।" বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ বিদায় হইলেন। শিবপ্রসাদও উঠিয়া বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। যাইবামাত্র দেখিলেন যে দিগম্বরী রোয়াকে বসিয়া চুল শুখাইতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিগম্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘটক এসেছিল?"

"এসেছিল।"

"কোন সন্ধান হ'ল?"

"না।"

"বারাসতের সে পাত্র কি হইল?"

"তাহার অন্য স্থানে সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।"

"তবে এখন উপায়? আর ত মেয়ে ঘরে রাখা যায় না?"

শিবপ্রসাদ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উপায় আর কি?—প্রবোধের সহিত বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলাম।"

দিগম্বরী অমনি ঈষৎ একটু নাকি সুরে বলিলেন, "তা তোমার মেয়ে, তুমি যা ইচ্ছে তাই কর; আমি যদি আর এ সম্বন্ধে কথা কই, তবে আমার দিব্যি।"

বেগতিক দেখিয়া শিবপ্রসাদ বলিলেন, "ওগো ক্ষমা কর, আর এই সকাল বেলা তোমায় নাকি সুর চড়া'তে হ'বে না! আমি অন্যত্র চেষ্টা ক'রছি।"

এখন, এই "ক্ষমা কর" কথাটী দিগম্বরীর প্রাণে বড়ই বাজিল। শিবপ্রসাদ বড় হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন, সুতরাং—"দাদা

আমার অকল্যাণ ক'রলেন" বলিয়া দিগম্বরী সেই মৃদু-মন্দ নাকিস্বরের আরও দুই চারি "গ্রাম" চড়াইয়া দিলেন।

তখন, বিষম বিপদে পড়িয়া শিবপ্রসাদ বলিলেন, "না, না, তোমার নিকট ব্যগ্রতা করি, তুমি চুপ কর। এতে তোমার কিছুমাত্র অকল্যাণ হবে না, বরং আমি বল্‌চি, এই আমার মাথায় যত চুল আছে, তত তোমার পরমায়ু হবে।"

এই কথা যেমন বলা—অমনি "আমার এক্ষুনি মরণ হোক্, এক্ষুণি মরণ হোক্" বলিয়া দিগম্বরী একেবারে 'ধেই ধেই' নৃত্য আরম্ভ করিলেন!

তদ্দর্শনে শিবপ্রসাদ বাহির বাটীতে পলায়ন করিলেন। এমন সময় একটী অন্ধ ভিক্ষুক দ্বারে দাঁড়াইয়া গাহিল—

"ও—মা দিগম্বরী নাচ গো!—"

গান শুনিয়া দিগম্বরীর তাল ভঙ্গ হইল। তখন হেমলতা গৃহ মধ্য হইতে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "না, না, পিসিমা থাম্‌লে কেন?—নাচ, নাচ!" দিগম্বরী হা! হা! শব্দে উচ্চ হাসি হাসিয়া দৌড়িয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

হেমলতা হাসিতে হাসিতে ভিক্ষা দিয়া অন্ধকে বিদায় করিল, এবং বলিয়া দিল যে, আবার যদি পিসিমা ঐরূপ করিয়া নাচেন, তবে যেন সে আসিয়া ঐ গানটী গায়।

---

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

## পরাজয়।

শ্যামাচরণের বাটীতে আজ মহাধূম! তাহার মাতা ভগিনী প্রভৃতি সকলেই কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়াছেন। শ্যামাচরণের সহসা অপর্য্যাপ্ত অর্থলাভ ও তৎসঙ্গে জমিদারী ক্রয়ের সংবাদ যথাসময়ে তাঁহাদের কর্ণ-গোচর হইয়াছিল,—তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা নাই। বাটী আসিয়া জমিদার পুত্রের ও জমিদার ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যরাশি ভোগ করিতে তাঁহারা অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। বিশেষতঃ ভগিনীগণের মেজাজ একেবারে ফিরিয়া গেল,—চাকুরে ভাইয়ের অন্ন আর তাহাদের ভাল লাগিল না,—তাহারা সর্ব্বদাই নাক তুলিয়া কথা কহিতে লাগিল। লালমোহন এই সমস্ত প্রত্যহই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

একদিন লালমোহনের মাতা কথায় কথায়, ইচ্ছা পূর্ব্বক, শ্যামাচরণের কথা পাড়িয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ্‌লে, তুমি ত তা'কে সর্ব্বদাই তুচ্ছ-তাচ্ছল্য কর্‌তে; সে এখন আপন অদৃষ্টের জোরে কত বড়লোক হ'য়েছে—আমি ত বরাবর বলি'চি, যখন তা'র কপালে অতবড় "রাজদণ্ড" আছে, তখন তা'র অন্ন খায় কে?"

লালমোহন ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন,—বুঝিলেন যে, তাঁহার মাতারও আর চাকুরে ছেলের ভাতে আস্থা নাই। এদিকে ভগিনী দুটা দিন দিন যেন রণমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। সুতরাং তিনি বিরক্ত হইয়া সকলকে কন্দর্পপুর পাঠাইয়া দিলেন এবং স্ত্রীকে লইয়া একাকী কলিকাতায় থাকায় নানারূপ অসুবিধা দেখিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

এইমাত্র তাঁহারা বাটী পৌঁছিয়াছেন,—গৃহ-প্রাঙ্গণে পা দিতে না দিতে বাড়ীখানি যেন "হাট" হইয়া উঠিয়াছে,—বাড়ীতে যেন মহা-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে; একেবারে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ! মাতা পথে আসিতে আসিতে গোপনে মেয়েদের এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলেন যে, "গোলমাল না করিলে বড় মানুষের বাড়ী মানায় না।"

সঙ্গে একটীমাত্র চাক্‌রাণী আসিয়াছে, বেচারীর মারা পড়িবার উপক্রম হইল; তাহাকে নানা জনে নানাপ্রকার ফরমাইস করিতেছে। শ্যামের মা বলিতেছেন যে, "আমার পা দুটোয় বড় কাদা লেগেছে, আগে ধুইয়ে দে।" বৃদ্ধা মাসী বলিতেছেন, "নৌকায় আর কোন জিনিষ পত্র পড়িয়া আছে কি না, শীঘ্র দেখে আয়।" বড় ভগিনীটী রান্নাঘরের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া একটু সোখীন সুরে

বলিতেছে, "ওলো! আগে এই ছাদের উপর তিন খানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে যা"। দাসী কোন্ কাজ আগে করিবে, কাহার হুকুম আগে মানিবে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া নাকে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কাজেই বিরাজমোহিনীর বড়ই রাগ হইল, সে ছাদ হইতে বিলক্ষণ রুক্ষ স্বরে বলিল, "আ মর্ মাগী! এখন আবার চর্কা কাট্তে ব'স্লেন। বলি, আমার কথা কি গ্রাহ্য হ'চ্ছে না? আগে এখানে তিন খানা পিঁড়ি দিয়ে যা; তার পর যত পারিস্ তোর ও মন্সার গান করিস্।"

চাকরাণী অগত্যা সর্ব্বাগ্রে তাহারই হুকুম তামিল করিল, ছাদে সারি সারি তিন খানি পিঁড়ি আসিয়া পড়িল। তখন বিরাজমোহিনী তাহার ছোট ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ওলো সোদি! বৌকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সৌদামিনী নীচে হইতে বলিল, "বৌ যেতে চায় না"।

তখন বিরাজমোহিনী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিল, "তা আস্‌বেন কেন? আমরা কি ওঁর সমযুগ্যী, আমাদের কথা গ্রাহ্য হবে কেন?"

বিরাজমোহিনী আরও কিছুক্ষণ "জটিলার চণ্ডী-পাঠ" করিত, কিন্তু মঙ্গলাচরণেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইল; অল্পক্ষণ পরেই সৌদামিনী ও লালমোহনের স্ত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তখন তিন জনে হেমলতাদের বাড়ীর দিকে পিছন করিয়া তিন খানি পিঁড়িতে বসিল, এবং ভগিনীদ্বয় আপন আপন মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিল ও বৌকেও সেই রূপ করিতে বলিল; কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হইল

না। তখন বিরাজমোহিনী আবার রাগে গর-গর হইয়া কি বলিতে বলিতে জোর করিয়া তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া দিল।

বিরাজমোহিনীর এরূপ করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল,—তাহাদের মাথায় রূপার কতকগুলি নূতন ফুল-কাঁটা হইয়াছে, সেই ঐশ্বর্য্যরাশি হেমলতাকে দেখাইবার জন্য তাহার এত আগ্রহ।

বস্তুতঃ তাহার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধও হইল। সেই সময় হেমলতা ও সরোজ একত্র বসিয়া গল্প করিতেছিল। বিরাজদের ছাদে দাঁড়াইয়া পিঁড়ির জন্য চীৎকার এবং তার পর সৌদামিনী ও বৌকে সেখানে আহ্বান, প্রভৃতি সমস্তই তাহারা শুনিয়াছিল; কিন্তু তখন তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। পরে যখন তাহারা তাহাদের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া, একে একে মাথার কাপড় খুলিয়া দিল, তখন সরোজ বুঝিল, কিন্তু হেমলতা বুঝিল না।

সরোজ ভারি দুষ্ট। সে হাসিতে হাসিতে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে হেমলতাকে বলিল, "হ্যাঁ, সই! তোর সে দিন যে মাথার সাজ এসেছে একবার আন্‌তো দেখি—আমি ভাল ক'রে দেখিনি।" বলিয়া আপনি তাহার আঁচল হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিল; খুলিয়া গহনাগুলি সমস্ত বাহির করিয়া একে একে হেমলতাকে পরাইয়া দিল,—দিয়া বলিল "চল্ ভাই আমরা একবার ছাদে যাই।" বলিয়া জোর করিয়া হেমলতাকে টানিয়া লইয়া দ্বিতল ছাদের উপর উঠিল,—উঠিয়া যে দিকে বিরাজমোহিনীরা বসিয়াছিল সেই দিকে পিছন ফিরাইয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল,—দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওগো পাড়ার লোক! তোমরা সকলে দেখ, আজ আমার সই

সোণার ফুল-কাঁটা মাথায় দিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে র'য়েচে; তোমাদের চোক্ থাকে ত দেখে নেও।”

এতক্ষণের-পর হেমলতা সমস্ত বুঝিতে পারিল। সে দৌড়িয়া সরোজিনীর নিকটে যাইয়া গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল,—“পোড়ার-মুখি! এই জন্তে বুঝি তুই গহনা দেখবার ছুতো ক'র্‌লি?” সরোজ হেমলতার হাত ছাড়াইয়া উচ্চহাসি হাসিল।

শ্যামাচরণের ভগিনীগণ যখন দেখিল যে তাহারা বিলক্ষণ পরাভূত হইল,—তাহাদের মাথায় দুই চারিটী রূপার ফুল মাত্র, কিন্তু হেমলতার মাথার সাজ সমস্ত সোনার, উহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে তাহারা অপারগ, সুতরাং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাই ভাল,—তখন দুই ভগিনীতে চুপে চুপে কি বলাবলি করিয়া বিষণ্ণবদনে উঠিয়া গেল; লালমোহনের স্ত্রীও সময় বুঝিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল; সে সময় যদি কেহ তাহার মুখের প্রতি চাহিত, তবে দেখিতে পাইত যে, তাহার মুখে আহ্লাদের হাস্য-রাশি যেন উথলিয়া পড়িতেছে।

সরোজ উহাদিগের এইরূপ সাহসা রণভঙ্গ দেখিয়া আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। হেমলতা আবার তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “আবার, আবার? চুপ্ কর্ বল্‌চি।” বলিয়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

## শেষ আশায়।

ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সুহৃদ্‌বরের ঘটকালী করিতে গিয়া শিবপ্রসাদের নিকট বিদায়ের অন্যায়রূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। কিন্তু পথে আসিতে আসিতে শ্যামাচরণের নিকট সে সমস্ত কথা গোপন করিবে স্থির করিল। সে "পণ্ডিত লোক" হইয়া পণ্ডিতের নিকট এরূপ অপদস্থ ও অবমানিত হইয়াছে শুনিলে লোকে কি মনে করিবে? অতএব ইহা একেবারে গোপন করাই উচিত। ঈশ্বর চন্দ্রের কীল খাইয়া কীল চুরি করা অভ্যাসটী বিলক্ষণ ছিল। সুতরাং সে তাহার দৌত্য-কার্য্যের পরিণাম-ফল গোপন করিয়া শ্যামাচরণের নিকট যাহা বলিবে তাহা নিমেষের মধ্যে স্থির করিয়া লইল। সে শ্যামাচরণের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে বন্ধু "বাহির-দেওয়ানে বার দিয়া" বসিয়া আছেন। সে যাইবামাত্র শ্যামাচরণ ভৃত্যকে

ডাকিয়া তামাক দিতে বলিল। শ্যামাচরণ এখন একটী চাকর রাখিয়াছে,—সময় বিশেষে তাহাকে কখন "পেয়াদা," কখন "পাইক," এবং কখন বা "খানসামা" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল। শ্যামাচরণ জানিত যে বড় মানুষের গৃহে, বিশেষতঃ জমিদার বাড়ীতে, ঐরূপ অনেকগুলি ভৃত্য থাকে, কিন্তু তাহার তত অধিক চাকর রাখিবার ক্ষমতা কোথা? সুতরাং ঐ একটীকেই সময় অনুসারে বা প্রয়োজন মত নানা প্রকার আখ্যা প্রদান করিয়া মনে মনে মহা সন্তোষ লাভ করিত।

শ্যামাচরণের আজ্ঞামত তাহার বহুরূপী বা বহুনামা ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। ঈশ্বরচন্দ্র তামাক টানিতে টানিতে সহাস্য মুখে বন্ধুর প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিল। শ্যামাচরণ সে হাসির অর্থ বুঝিল, এবং আপনিও একটু হাস্য করিয়া বলিল, "সব ঠিক? কেমন, মঙ্গল ত?"

ঈশ্বরচন্দ্র আর একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "যেখানে ঈশ্বর, সেখানে আবার অমঙ্গল কোথা? বিশেষতঃ যখন সাক্ষাৎ শিব অর্থাৎ মঙ্গলের নিকট যাওয়া হয়েছিল।"

শ্যামাচরণ ঈশ্বরের এই পাণ্ডিত্য বুঝিতে পারিল না।" তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিল যে, তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। সে আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বন্ধুকে তাহার দৌত্যকার্য্যের ফলাফলের সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিতে কহিল। ঈশ্বরচন্দ্র বলিল "তোমার সমস্ত শোন্‌বার প্রয়োজন নাই, তবে মোটামুটী বলি—আমি প্রথমে তোমার কথা পাড়তেই তিনি বিশেষ বিরক্ত হ'য়ে উঠেন, কিন্তু শেষে কথার বাঁধুনী ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে একেবারে

তাঁ'কে বশীভূত ক'রে ফেল্‌লেম, পরে অনেক কথাবার্ত্তা—অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁ'কে একপ্রকার স্বীকার করিয়ে এসেছি—এখন তোমার কপাল। আমার বোধ হয় তুমি একবার তাঁ'র সঙ্গে দেখা ক'রে দুই একটী কথা বল্‌লেই তোমার কাজ হাসিল হ'বে। ভাবে বোধ হ'ল, তিনি মনে মনে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, তবে কি না –"

ঈশ্বরচন্দ্র কথা সমাপ্ত করিল না,—কেন, তাহা সে জানে।

কিন্তু শ্যামাচরণ তাহার এ সকল কথা শুনে নাই, সে আহ্লাদে ভাবী সুখ ভাবনায়, একেবারে অজ্ঞানপ্রায় হইয়াছে,—ভাবিতেছে যেন হেমলতা তাহার হইয়াছে,—

ঈশ্বরচন্দ্র বলিল "এখন তুমি একবার তাঁহার নিকট গেলেই সমস্ত ঠিক হ'য়ে যা'বে।"

"আমি আজই যা'ব।"

"না, আজ না, কাল যেও।"

ঈশ্বরচন্দ্র কেন যে শ্যামাচরণকে শিবপ্রসাদের নিকট আজ যাইতে নিষেধ করিল, তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকা বুঝিয়াছেন।

শ্যামাচরণ বন্ধুর কথা শুনিল এবং পরদিন প্রাতঃকালে উত্তমরূপ বেশ ভূষা করিয়া শিবপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইল। সে যাইবামাত্র শিবপ্রসাদ একবার তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন—কোন কথা কহিলেন না। শ্যামাচরণ ধীরে ধীরে যাইয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি আপনার নিকট আসিলাম।"

শিবপ্রসাদ কিঞ্চিৎ রুক্ষ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি জন্য?"

শ্যামাচরণ তখন লজ্জাবিনম্র ভাঙ্গা স্বরে আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিল, এবং তাহার সহিত হেমলতার বিবাহ দিলে, তাহার সুবৃহৎ তালুকখানি হেমলতার নামে লেখাপড়া করিয়া দিবে, এ কথাটীও সেই সঙ্গে বলিতে ভুলিল না,—ভাবিল শিবপ্রসাদ এই লোভে তাহার প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইবেন।

শ্যামাচরণ তাহার প্রবাদ-মূলক জমিদারীকে "তালুক" বলিতে বড় ভাল বাসিত,—ভাবিত "জমীদারী" অপেক্ষা "তালুক" কথাটী আরও উচ্চ দরের!

শিবপ্রসাদ শ্যামাচরণের কথা শুনিয়া ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাপু! তোমার ও তালুকদারী লাখ-পঞ্চাশী কথা আমাদের কাছে ব'লো না—আমরা সমস্ত জানি। ও সব তোমার মূর্খ ইয়ারদের নিকট বলগে। তোমার ন্যায় অকাল-কুষ্মাণ্ডকে কন্যা দান করা আর চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করা সমান।"

শ্যামাচরণ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। সে জমিদার, বড় লোক, শিবপ্রসাদ তাহাকে গ্রাহ্য করেন না, বরং যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিয়া থাকেন, ইহা কি তাহার সহ্য হয়? সে আর ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া শিবপ্রসাদকে বিস্তর কটু কথা কহিয়া ভয় দেখাইল।

শিবপ্রসাদ বলিলেন, "পাজি! আমার বাটীতে বসিয়া আমায় কুবাক্য? দূর হ বলচি!"

শ্যামাচরণ ক্রোধভরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "আচ্ছা! আমিও এর প্রতিশোধ ল'ব—দেখ্‌ব, কেমন ক'রে আপনার

কন্যার বিবাহ হয়। আমি সকলকে ব'লে দিব, আপনার কন্যা প্রবোধের অভিসারিণী হ'য়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখি'ছি—স্বয়ং ধরি'ছি।"

শিবপ্রসাদ পাপিষ্ঠের এই ঘোর অনৃত বাক্যে, এই কুৎসিত কথায়, একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি সরোষে দণ্ডায়মান হইয়া শ্যামাচরণের বক্ষে সজোরে এক পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "নরাধম দূর হ, এখনও দূর হ বল্‌চি, নতুবা পদাঘাতে তোর ঐ মুখ চূর্ণ করিব।"

মহাতপা ভৃগুমুনির পদ-প্রহারে ত্রিলোকতারণ জনার্দ্দন কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জানি না,—আজ শিবপ্রসাদের পদাঘাতে শ্যামাচরণ ধরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষিপ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া শিবপ্রসাদকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া শিবপ্রসাদ কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া দাঁড়াইলেন। শ্যামাচরণ ক্রোধভরে চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল,—সুতরাং বাটীর মধ্যে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিল। এমন সময়ে প্রবোধচন্দ্র দ্রুতগতিতে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং শ্যামাচরণকে রুদ্রবেশে শিবপ্রসাদকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতে দেখিয়া শীঘ্র নিকটে আসিয়া "আর বীরত্বে কাজ নাই" বলিয়া দৃঢ়রূপে তাহার উভয় হস্ত ধারণ করিলেন। শ্যামাচরণ হাত ছাড়াইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; শেষে ক্রোধভরে বলিল, "আমার হাত ছাড়্ বল্‌চি, নইলে ভাল হ'বে না।"

"না হয় মন্দই হোক্", বলিয়া প্রবোধচন্দ্র আরও একটু শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। শ্যামাচরণ আর সহ্য করিতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। শিবপ্রসাদ প্রবোধকে বলিলেন, "দেও, ও পাজিকে এখনই আমার বাড়ী হ'তে দূর ক'রে দেও।"

প্রবোধচন্দ্র শ্যামাচরণের হাত ধরিয়াছিলেন, শিবপ্রসাদের আজ্ঞা পাইবামাত্র তাহাকে সজোরে টানিয়া বালকের ন্যায় দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "যাও, এখনও মানে মানে বিদায় হও, নতুবা তোমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে।"

"আচ্ছা, আমিও এর ষোল আনা প্রতিশোধ তুল্‌বো" বলিয়া শ্যামাচরণ পুনর্ব্বার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল।

প্রবোধচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ক্ষমতায় যতদূর হয়, সেইমত ক'র্‌তে ত্রুটি ক'র না, এখন দূর হও"। এই বলিয়া বিড়াল যেরূপ ক্ষুদ্র মূষিকশাবককে লইয়া যায়, তিনি সেইরূপ শ্যামাচরণের ঘাড় ধরিয়া লইয়া দরজার বাহির করিয়া দিলেন।

আজ যেন প্রবোধচন্দ্র কোন দৈববলে অপরিমিত বলশালী হইয়াছেন।

শ্যামাচরণ চলিয়া গেলে, শিবপ্রসাদ প্রবোধচন্দ্রকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং উভয়ে বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

সেই দিন—সেই চন্দ্র-কর-দীপ্ত সুখময়ী যামিনীতে তাঁহার হৃদয়-প্রতিমার সহিত হৃদয়-বিনিময়ের পর—হইতে প্রবোধচন্দ্র আর এ বাটীতে পদার্পণ করেন নাই; এতদিন স্থিরভাবে নির্জ্জনে বসিয়া সেই আরাধ্যদেবীর উদ্বোধন করিতেছিলেন; আজ

ঘটনাক্রমে তিনি সেই পবিত্র আবাস-গৃহে আসিয়া আবার উপস্থিত হইয়াছেন,—কত শত চিন্তাপ্রবাহে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। কত দিন তিনি এই স্থানে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন, আর সেই স্ফুটনোন্মুখ কুসুমসদৃশ বালিকা রক্তিম অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি টিপিয়া একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত—তাঁহার পাঠ ভুলাইয়া দিত। তিনি পুস্তক ত্যাগ করিয়া বিভ্রান্ত নয়নে বালিকার সেই অনুপম রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতেন এবং কত শত সুখস্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু আজ? আজ তাঁহার হৃদয় এরূপ শূন্যময় কেন? সেই সুখময়ী আশা কি তাঁহার হৃদয় হইতে দিন দিন অন্তর্হিতা হইতেছে? তিনি কি হেমলতাকে এ জীবনে পাইবেন না?

শিবপ্রসাদ তাঁহাকে সাংসারিক নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি অন্যমনে বসিয়া উত্তর দিতেছেন,—কিন্তু কি উত্তর দিতেছেন, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন না,—কখন "হাঁ" স্থানে "না", কখন বা "না" স্থানে "হাঁ" বলিতেছেন। শিবপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। এমন সময় কোথা হইতে হেমলতার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল,—প্রবোধচন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল,—শিরায় শিরায় শোণিতরাশি যেন অপূর্ব্ব তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু দুইটী আপনা হইতে সহসা নিমীলিত হইয়া গেল, যেন তিনি আপন অন্তর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া সেই সুস্বরলহরী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন আপনাকে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা কি জন্য চম-

কিয়া উঠিলেন,—সেই প্রগাঢ় ভাব-নিদ্রা ছুটিয়া গেল,—সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি দুই একটী কথায় শিবপ্রসাদের নিকট বিদায় লইয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## দেব-মন্দিরে।

কন্দর্পপুরের উত্তর প্রান্তে এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলদেশে একটী ক্ষুদ্র শিব-মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরটি বহু পুরাতন। একবার ঐ সুবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উহার প্রাচীনত্ব অনুভব করা যায়। বৃক্ষটি প্রথমতঃ মন্দিরের শিরোদেশে অঙ্কুরিত হইয়াছিল; কালসহকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অসংখ্য শিকড়জাল বিস্তার করিয়া, উহার প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ড গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরিশেষে ভূমিতল স্পর্শ করিয়া এক্ষণে প্রকাণ্ডকায় ধারণ করিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে, বোধ হয়, যেন কোন সুচতুর স্থপতি সুকৌশলে বৃক্ষকাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া এই অপূর্ব্ব মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছে। মন্দিরটি কত পুরাতন, অথবা কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক ইহা

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে এক অপূর্ব্ব জনশ্রুতি আছে,—সকলে বলে যে, প্রত্যহ ঘোর নিশাকালে এক ভয়ঙ্কর রুদ্র-পিশাচ অসংখ্য ভূত-প্রেত সঙ্গে লইয়া ভয়াবহ গাল-বাদ্য ও ভৈরব তাণ্ডব সহকারে এই মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কোন লোক সন্ধ্যার পরে প্রাণান্তেও এদিকে আসিতে সাহস করে না।

কিন্তু আজ তামসী সন্ধ্যার সমাগমে দুইটি মনুষ্য-মূর্ত্তি এই ভয়াবহ মন্দির মধ্যে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মনুষ্যদ্বয়ের মধ্যে একটী রমণী, অপরটী পুরুষ। উভয়েই স্থির গম্ভীরভাবে অবনতমস্তকে দাড়াইয়া যেন কোন গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতেছে। কেহ যেন সাহস করিয়া সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিতেছে না। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইল; পরিশেষে পুরুষটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তকোত্তোলন করিয়া রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কিছু ভগ্ন অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হেমলতা! বুঝিলে আমি কি জন্য তোমাকে এখানে আহ্বান করিয়াছিলাম?"

রমণী কোন কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ অবনতমস্তকে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন তাহার অন্তরস্থ সেই অনন্ত চিন্তাসাগরে বাহ্যেন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। যুবকের কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

যুবক উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "হেমলতা! বুঝিলে না? তবে আবার বলি,

শোন! এ সংসারে আমাদের হৃদয়ের আশা ফুরাইয়াছে,—সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে,—নিশ্চয় বুঝিয়াছি তুমি আমার হইবে না। তবে আর বৃথা আশায় আশ্বাসিত হই কেন? নিশ্চয় জানিয়াছি, এ দগ্ধ শ্মশানভূমিতে যে একটা স্বর্গীয় কুসুম হাসিতেছিল, নিষ্ঠুর সংসার তাহা সবলে উৎপাটিত করিবেই করিবে। তাই বলি, হেমলতা! আর কেন? সমস্ত ভুলিয়া যাও,—ভাব, এ পৃথিবীতে তোমায় আমায় কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, 'প্রবোধ' নামে কোন হতভাগ্য এই নিষ্ঠুর সংসারে জন্মগ্রহণ করে নাই। হেমলতা! মনে করিয়া দেখ, সেই দিন—সেই জাহ্নবীতীরে তোমাকে কি কথা বলিয়াছিলাম! তুমি তখন আমার কথা শুন নাই, আপনার অবস্থা বুঝ নাই, পরিণামের দিকে একবার চাহিয়া দেখ নাই, চঞ্চলমতি বালিকার ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; এখন হেমলতা! এখন কি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছ? তবে এস, এই দেব-সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা কর আমায় ভুলিবে? হৃদয় হইতে স্মৃতির অনন্ত লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে? আজ হইতে তোমায় আমায় যাহা কিছু সমস্তই বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত করিবে?

হেমলতা এবারও কোন কথা কহিল না। পূর্ব্ববৎ নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রবোধচন্দ্র পুনর্ব্বার উত্তরের আশায় কিছু ক্ষণ থাকিয়া কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "হেমলতা! শুনিলে না?"

যুবার সেই গম্ভীর স্বর যেন রজনীর সেই ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। রমণী চমকিত হইয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল, "না, তাহা পারিব না।"

যুবা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রুক্ষ স্বরে বলিলেন "পারিবে না?".

এতক্ষণ হেমলতার হৃদয়ের ক্ষুদ্র বলটুকু কোথা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, সহসা যেন তাহার পুনরাবির্ভাব হইল। হেমলতা পুনর্ব্বার দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল, "না, তাহা কখনই পারিব না। এ হৃদয় বিদীর্ণ না হইলে, এ পাপদেহ ভস্মীভূত না হইলে কখনই পারিব না। তুমি দেবতা, তুমি ভুলিতে পার, কিন্তু আমি সামান্য মানবী—পাপিনী,—তাহা কখনই পারিব না,—এ জীবন থাকিতে পারিব না। সত্য বটে এ সংসারে আমি একাকিনী দুর্ব্বল বালিকা—আমার অসংখ্য বৈরী আমার সুখের স্বর্গপথের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে,—সম্মুখে নিরাশার দুস্তর মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে,—কিন্তু তথাপি আমার হৃদয়ের বল ত আছে? তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক, প্রলয়ের ভীষণ ঝড় যতই তাহার উপর দিয়া বহিয়া যাউক, তথাপি তাহা অচল অটল থাকিবে। এ দেহ দগ্ধ না হইলে তাহা যাইবার নয়, এ হৃদয় সহস্র খণ্ডে চূর্ণিত না হইলে, তোমার ও দেবমূর্ত্তি ইহা হইতে বিলুপ্ত হইবে না। ভুলিব? কাহাকে ভুলিব দেব? এ হতভাগিনী তোমাকে ভুলিলে আর কি লইয়া সংসারে থাকিবে? পারিব না,—পারিব না,—এ জীবন থাকিতে তাহা পারিব না।" বালিকা নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিল।

"পারিবে না? তবে তোমায় আমায় সাক্ষাৎ এই পর্য্যন্ত।" বলিয়া যুবক চকিতের ন্যায় মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, হেমলতার সহিত তাঁহার এ জীবনে মিলন হইবে না; অতএব কেন অনর্থক অলীক আশায় থাকিয়া হেমলতাকে দুঃখভাগিনী করেন? ইহা বুঝিয়া তিনি মনে

মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হেমলতার মন হইতে তাঁহার স্মৃতি উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হইতে দূরে রাখিয়া, যাহাতে সে সর্ব্বসুখিনী হইতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। ভাবিলেন, যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে যদি সুখী না করিতে পারিলাম, তবে আর আমার ভালবাসা কি? যে ভাল-বাসার মধ্যে স্বার্থপরতা বিরাজমান, সে ভালবাসা ভালবাসাই নহে। এই জন্যই তিনি সে দিন হেমলতার পিতার সহিত কথা কহিতে কহিতে আপন মনের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া সহসা সে স্থান হইতে উঠিয়া আসেন, এবং সেই জন্যই আজ তিনি এই নিভৃত দেবমন্দিরে হেমলতাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন।

কিন্তু হেমলতা বুঝিল না।

প্রবোধচন্দ্র চলিয়া গেলে হেমলতা বজ্রাহতের ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর মন্দির মধ্যে একা বসিয়া কতক্ষণ ধরিয়া নীরবে রোদন করিল। পরে হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া আসিলে যোড়হস্তে দেবতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সজল নয়নে বলিল, "দেব! তুমি ত অন্তর্যামী! এ হতভাগিনীর হৃদয়ের যাহা কিছু তাহা ত তুমি জানিতে পারিতেছ। বল, দেব! বল আমার হৃদয়ের দেবতাকে কি এ জীবনে আমি পাইব না? এ পাপিনীর সকল আশা—সকল ভরসা—কি ফুরাইয়া যাইবে? কেহ নাই দেব! এই নিষ্ঠুর সংসারে এ অনাথিনী নিঃসহায়া বালিকার আর কেহই নাই; কেবল তুমিই তাহার এক-মাত্র ভরসা। তবে, বল দেব! বল, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র বলটুকুও কি এ অভাগিনী হারাইবে?"

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## পরীক্ষা।

আজ শিবপ্রসাদের অন্তঃপুরে মহাধুম। কয়েক দিবস হইল, তিনি কোথা হইতে "রাজভোগ" নামক এক প্রকার তণ্ডুল আনিয়াছেন; দিগম্বরীর কুগ্রহ,—তিনি গ্রামের কয়েকটী দামোদরীর নিকট সেই চাউলের অসামান্য গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা আজ বৈকালে দলে দলে তাহার সত্যাসত্যের বিষয় পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। একজন দিগম্বরীকে উদ্দেশ করিয়া কৌশলে তাঁহাদের আগমনের কারণ জ্ঞাত করাইলেন। তাহা শুনিয়া দিগম্বরীর মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহাদের এই প্রকাণ্ড পলটনের রসদ যোগাইতে হইলে স্বয়ং লক্ষ্মীরও মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে, দিগম্বরী ত কোন্ ছার। সুতরাং বেগতিক দেখিয়া দিগম্বরী প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহা কে শোনে?

পল্টনের অধিনায়িকা ঠাকরুণ দিদি তৎক্ষণাৎ দুই চারিটী তীব্র বিদ্রূপরূপ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে সে আপত্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গিনী দলের মধ্যে হাস্যের মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। শেষে দিগম্বরী উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা তাঁহাদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেনাসংক্রান্ত বিচারালয় বসিল ও স্থির হইল যে, দিগম্বরী সকলকে পরিতোষ করিয়া চাল ভাজা খাওয়াইবেন, তবে তাঁহার নিষ্কৃতি। অনন্যোপায় হইয়া দিগম্বরী উনন জ্বালিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সুরুচিগণ কেহ "বাটী" কেহ "কাঠা" এবং কেহ বা আপন অঞ্চল খানি বিস্তৃত করিয়া বসিয়া গেলেন। দিগম্বরী এক এক করিয়া সকলকে ভাজা দিতে লাগিলেন, সকলে তাহা তৈল লবণ সংযুক্ত করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ভীষণ কড়-কড় মড়-মড় ধ্বনি করিয়া উদরস্থ করিতে লাগিলেন;—যেন প্রমত্ত মাতঙ্গ-যূথ বংশ-বন বিদলিত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অধিকাংশ চাউল নিঃশেষিত হইয়া গেল। তখন দিগম্বরী অতি দীননয়নে তাঁহার অতিথিনীদিগের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই করুণ দৃষ্টি দেখিয়া একজনের একটু দয়া হইল,—তিনি বলিলেন, "আর না মা, তুমি এখন খোলা নামিয়ে ফেল। আহা! আগুণের তাতে বাছার মুখখানি রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দিগম্বরীর মুখ কখন লাল হয় না। যিনি দিগম্বরীর প্রতি এত স্নেহ প্রদর্শন করিলেন, তিনি গ্রাম-সম্পর্কে দিগম্বরীর পিসী হন। পিসি-মার এত স্নেহের কারণ, তাঁহার "ভরাখানি" একপ্রকার বোঝাই হইয়া উঠিয়াছিল, আর বেশী চাপাচাপি করিলে পাছে বিপরীত ফল হয়, এই ভয়েই তিনি দিগম্বরীকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাঁহার

কথা শুনিয়া দিগম্বরী একবার সকলের মুখের দিকে চাহিলেন, তখন সকলেই এক বাক্যে সেই "রায়ে রায়" প্রকাশ করিলেন, কেবল ঠাকরুণ দিদি কোন কথা কহিলেন না,—তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা আরও সেরখানেক হয়, কিন্তু আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না।

সুতরাং দিগম্বরী "খোলা" নামাইয়া ফেলিলেন। তখন আবার জলপানের ঘোর ঘটা পড়িয়া গেল।—এক এক জন যেন মূর্ত্তিমান জহ্নুমুনির ন্যায় সুরধুনী পান করিতে লাগিলেন! যাহা হউক, ক্রমে সে মহা ব্যাপারেরও সমাধা হইল। তখন সকলে স্থির ভাবে বসিয়া নানারূপ গল্প আরম্ভ করিলেন। গ্রামের বৌ, ঝী, এমন কি পাঁচ বৎসরের বালিকা হইতে পক্ককেশা বৃদ্ধা পর্য্যন্ত ( অবশ্য তাঁহারা ব্যতীত ) কেহই তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বা তীব্র সমালোচনার হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে হেমলতার কথা উঠিল,—"তাহার বিবাহের কি হইতেছে," "কোন স্থানে সম্বন্ধ ঠিক হইল কি না", "মেয়ে আর আইবুড় রাখা ভাল দেখায় না", ইত্যাদি নানা জন নানা কথা বলিতে লাগিলেন। দিগম্বরী ঈষৎ নাকি সুরে উত্তর করিলেন, "সম্বন্ধ ত অনেক জায়গায় হ'চ্ছে, কিন্তু কোন খানে ঠিক হয়নি।"

শ্যামা। "তবে উপায়? কর্ত্তা ভাবচেন কি? ও মা! এত বড় আইবুড় মেয়ে ঘরে, আর তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছেন? হেমাকে দেখলে আমাদেরই গায়ের এক চমক রক্ত শুকিয়ে যায়। ছি! ছি! তোদের হাতের জল খাওয়া উচিত নয়।" অদ্য ব্যতীত )।

দিগম্বরী। "ভাব্‌বেন আর কি আমার মাথা? এখন তাঁর ইচ্ছে হ'য়েছে যে প্রবোধের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু আমি তাতে নারাজ।" এই বলিয়া দিগম্বরী তাঁহার যে যে কারণে এই বিবাহে অসম্মতি তাহা একে একে বিবৃত করিলেন।

শ্যামাঠাকুরাণী তখন মুখভঙ্গি সহকারে চক্ষু দু'টী উল্‌টাইয়া সঙ্গিনীদের দিকে চাহিয়া একটু ঘন ঘন কথায় বলিলেন, "তা ভাই ঠিক কথা বলব, দিগম্বরী যা বল্‌লে তা যথার্থ। এ রকম 'ঘরো' জামাই হ'লে যেন কেমন কেমন ঠেকে, কোন সাধ আহ্লাদই ভাল লাগে না,— সমস্তই যেন কেমন এলো মেলো ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়; আর শেষেরটি! মাগো গা শিউরে ওঠে।

এই মন্তব্যে সকলেই একমত হইলেন। সকলেই দিগম্বরীকে বলিলেন, "তুই এ সম্বন্ধে কখনই মত দিসনে। ওঁর কি?—উনি বুড়ো হয়েছেন, তাই বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়েছে। প্রবোধ ছেলে ভাল, বিষয়-আশয়ও আছে বটে, কিন্তু সংসারে আর কে আছে বল দেখি? এক বুড়ী মা, তা, সে আজ আছে কাল নেই।—অমন শিবরাত্রের সলতেকে মেয়ে দিতে আছে কি?"

তখন ঠাকরুণ-দিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কোন জায়গায় আজও সম্বন্ধ ঠিক হয় নি? তা, দাঁড়া, আজ আমি তোর হিমির বরের ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কোন্ কোন্ জায়গা হতে সম্বন্ধ এসেছে বল্ দেখি?"

দিগম্বরী একে একে সকল নাম করিলেন, তিন স্থানে সম্বন্ধ হইতেছে।

ঠাকরুণ-দিদি। "আচ্ছা, এক কাজ কর, অই তিনটে উন

জ্বাল, জ্বেলে তিনটে হাঁড়ি চড়িয়ে দিয়ে একটু একটু জল দে, আর একজন গিয়ে হেমলতাকে ডেকে আন্।'

দিগম্বরী তৎক্ষণাৎ ঠাকরুণ-দিদির হুকুম তামিল করিলেন। তখন একজন দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হেমলতাকে ডাকিতে গেল।

আজ হেমলতার অদৃষ্ট পরীক্ষা হইবে!—

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## সখী-সম্মিলনে।

হেমলতা হেমন্তের শতদলের ন্যায় দিন দিন মলিন শোভাহীন হইতেছে, তাহার শরীরে যেন আর সে লাবণ্য নাই। প্রাবৃটের কুলপ্লাবিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় যে অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি পূর্ব্বে তাহার অঙ্গে অঙ্গে ক্রীড়া করিত, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উছলিয়া পড়িত, এখন যেন সে সৌন্দর্য্য-স্রোত আকস্মিক কোন দৈব কারণে মন্থরগতি ধারণ করিয়াছে। অধরের সেই সুধামাখা হাসি-রাশি আর সেরূপ ভাবে অধর-প্রান্তে ক্রীড়া করে না। রৌদ্র-তপ্ত ছিন্ন গোলাপ-দলের ন্যায় অধর খানি এখন মলিন বিশুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে। হেমলতা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক; সর্ব্বদাই যেন এ পৃথিবী ছাড়িয়া তাহার মন কোন অনির্দ্দিষ্ট প্রদেশে বিচরণ করিতেছে।

দিগম্বরী এ ভাব লক্ষ্য করেন, কিন্তু ভাবেন, এ সকল সময়ের ভাবনা; সময় হইলেই আপনা হইতে কোথায় চলিয়া যাইবে।

হেমলতার বিবাহসম্বন্ধে শিবপ্রসাদের সহিত দিগম্বরীর প্রায়ই কথাবার্ত্তা হয়। হেমলতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সমস্ত শুনে। যখন অন্য কোন স্থানে বিবাহের কথা হয়, তখন হেমলতার মুখ শুকাইয়া যায়, হাত পা কাঁপিতে থাকে, কাণে যেন তালা লাগিয়া যায়, আর সে দাঁড়াইতে পারে না; বোধ হয় যেন, সমস্ত পৃথিবী ভীষণবেগে ঘুরিতেছে,—হেমলতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়ে। আবার যখনই তাহার পিতার মুখে প্রবোধের নাম শুনিতে পায়, সহসা যেন তাহার চমক ভাঙ্গিয়া যায়, হৃদয় দুরু-দুরু করিতে থাকে; কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনে যে প্রবোধচন্দ্রের নাম শুনিবামাত্র দিগম্বরী নাসিকাতন্ত্রী বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার সহিত বিবাহ হইলে, তিনি "কায়া পরিবর্ত্তন" করিবেন বলিয়া শিবপ্রসাদকে ভয় দেখাইতেছেন, তখন যেন সে আবার চতুর্দ্দিক শূন্য দেখে, তাহার শুষ্ক অধর আরও শুকাইয়া যায়। তখন সে সজলনয়নে উর্দ্ধমুখে কত দেবতার নিকট প্রার্থনা করে,—বলে, "হে পরমেশ্বর! পিসি-মার কণ্ঠ হ'তে এ দুষ্ট সরস্বতী দূর ক'রে সু সরস্বতী বসাও।" কিন্তু কলির দেবতা সকলেই নিদ্রিত, হেমলতার এই করুণ প্রার্থনায়, আন্তরিক আবাহনে, তাঁহাদের দেব নিদ্রা ভঙ্গ হয় না।

সরোজ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হেমলতার নিকট আসে। যতক্ষণ সে থাকে ততক্ষণ যেন হেমলতা প্রফুল্ল সজীব ভাব ধারণ করে,—কত হাসে, কত গল্প করে, উভয়ে মিলিয়া কত পরিহাস করে। কোনদিন বা সে হেমলতাকে নিজ বাটীতে ডাকিয়া পাঠায়, সেখানে যোগেন্দ্রনাথের স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া তিনজনে নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ করে।

কাল কি জন্য সরোজ আসিতে পারে নাই, আজ এখনও তাহার দেখা নাই; সুতরাং হেমলতার মুখে দু দিন কেহ হাসি দেখে নাই;—যাহা দেখিয়াছে, তাহা কেবল তাহার স্বাভাবিক হাসি—হাসি-মুখের হাসি। সে হাস্যে কমনীয়তা আছে—উৎফুল্লতা নাই, সৌন্দর্য্য আছে—মাধুর্য্য নাই, তাহা লোকের মনে ভালবাসা ফুটা-ইতে পারে—কিন্তু হৃদয় কাড়িয়া লইতে পারে না। এক কথায়, সে হাসিতে সমস্তই আছে অথচ যেন কিছুই নাই।

হেমলতা দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছে—কি যেন ভাবিতেছে।—কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গ হইতে একজন বৈষ্ণব পদগায়ক আসিয়া তাহাদের বহির্বাটীতে বিস্তর সুললিত পদাবলী গাহিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি পদ হেমলতার বড় ভাল লাগি-য়াছিল।—আজি সহসা সেই পদটি তাহার মনে উদয় হইল,—মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়া উঠিল!—নব নির্ম্মিত জন-শূন্য নিস্তব্ধ অট্টালিকা মধ্যে তূর্য্যধ্বনির ন্যায় সেই কবিতাটী তাহার হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হেমলতা নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া শুনিতে লাগিল—হৃদয় গাহিতেছে—

—"কি আর কহিব আমি?
জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণসখা হৈও তুমি।
তোমার চরণে, এ মোর জীবনে, লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
কুল মান ভয়, সব তেয়াগিয়া, হইনু তোমার দাসী!"—

শুনিতে শুনিতে, ভাবিতে ভাবিতে, হেমলতা আপনা ভুলিয়া গেল; শূন্যনয়নে বাতায়ন পথ দিয়া শূন্য আকাশ প্রতি চাহিয়া

রহিল,—তখনও যেন তাহার হৃদয় গাহিতেছে।—"জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণসখা হৈও তুমি! "

এমন সময়ে নৈদাঘ প্রভাত বায়ুর ন্যায় মৃদু গতিতে মুখভরা হাসি হাসিতে হাসিতে সরোজ আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। আজ যেন সরোজের স্বভাবতঃ সেই চঞ্চল ভাব সহসা কোথা অন্ত-র্হিত হইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে যেন যুবতীজনোচিত গাম্ভীর্য্য আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাহার রূপ-রাশি আজ তাহার শরীরে ধরিতেছে না,—যেন চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে উথলিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে,—কিন্তু পড়িতেছে না। অরুণ কিরণ সম্পৃক্ত পূর্ব্বাকাশের ন্যায় তাহার গণ্ডদ্বয় অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত, ফুটনোন্মুখ রক্ত-পদ্মদলের ন্যায় নবীন নধর অধরোষ্ঠ দু'খানি ঈষৎ বিকশিত!—যেন সময়ের অপেক্ষা করিতেছে, সময় হইলেই সুধার অনন্ত-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবে। আজ সহসা সরোজের এই অপূর্ব্ব ভাব, অপূর্ব্ব বেশ এবং অভিনব রূপ ধারণের কারণ কি?

হেমলতাকে দেখিয়াই সরোজ একদৌড়ে তাহার নিকটে গিয়া দুই হাত দিয়া গলা জড়াইয়া কি বলিবার জন্য তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গেল; হেমলতা হাসিতে হাসিতে বলিল—"আর বল্‌তে হবে না, আমি তোর ভাব দেখেই সব বুঝিছি।—কতক্ষণ?"

সরোজ অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি টিপিয়া ঢুলু ঢুলু চক্ষে উত্তর করিল, "সকালে।"

হেম। "আ মরণ! যেন উথ্‌লে পড়্‌চেন! এত যদি, তবে এখন ছেড়ে এলি কেন?"

সরোজ। "তোকে ডাক্‌তে এসেছি.—দু'জন না হ'লে আজ সে বেগ ধারণ করা একা আমার সাধ্য নয়!"

হেমলতা সরোজের গালে একটী ছোট রকমের চড় মারিয়া বলিল, "পোড়ার মুখি! যত বড় মুখ তত বড় কথা?"

সরোজ গালভরা হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোকে যে ভাই বড্ড ভালবাসি!"

আজ সরোজের স্বামী আসিয়াছেন। তাই সেই সুসংবাদ সইকে দিবার জন্য সরোজ তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধার সরঞ্জামগুলি হাতে করিয়া, এই অপূর্ব্ব বেশে সইয়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত! আজ 'সই' ভিন্ন অপর কাহারও কাছে তাহার চুল বাঁধা মনঃপূত হইল না।

হেমলতা তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার হাত হইতে সে গুলি লইয়া বলিল, "আয়, আজ তোর 'নাগর-ভুলানি খোঁপা বেঁধে দি'—বলিয়া তাহার সেই আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি ধরিয়া আঁচড়াইয়া বেণী বিনাইতে লাগিল, পরে একটী অপূর্ব্ব কবরী বাঁধিয়া দিয়া সীমন্তে সিন্দূর পরাইয়া দিল। সরোজ তখন দর্পণে একবার মুখ দেখিবার উপক্রম করিল, কিন্তু হেমলতা দেখিতে দিল না, বলিল, "দাঁড়া, এখনও হয়নি, একটু পরে দেখিস্!" তখন আপন বাক্স হইতে একখানি ক্ষুদ্র টিপ বাহির করিয়া বামহস্তে সরোজের গাল দু'টী ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহা পরাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিল—

"প্রেম-শিকলে বাঁধা তুমি 'হীরেমণ' আমার।
রাখব তোমায় হৃৎ-পিঞ্জরায়,—কোথা যা'বে আর?

নয়ন ভ'রে দেখব তোরে বসি' নিরন্তর —
প্রেম-শিকলে টান্‌ব--যদি উড়্‌-উড়্‌ কর।"

সরোজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "মরণ আর কি! তোর এতও আসে।"

হেমলতা হাসিতে হাসিতে তখন তাহার সম্মুখে আর্শিখানি ধরিয়া বলিল, "দেখিস্, যেন ঘুরে পড়িস্‌নে! দেখ্‌ ভাই, আজ এক কাজ করিস্,—যখন ঘরে যা'বি, তখন এক ঘটী জল আর একটু আদা নিয়ে যেতে যেন ভুলিস্‌নে"।

সরোজ বিস্মিত হইয়া ব'লিল, "কেন তা'তে আবার তোর কি পিণ্ডি হ'বে?"

"দেখিস্, দরকার হ'বে—না নিয়ে গেলে, তখন আপ্‌শোষ করবি।"

সরোজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা তুইও থাক্, তোর কি বিয়ে হ'বে না? তুই এখন যেমন ক'রচিস, আমিও তোর বর হ'লে উচিত প্রতিশোধ নেব।"

হেমলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যদি আমার বরের সঙ্গে তোর সম্পর্ক বিরুদ্ধ হয়?"

হেমলতা কাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা ব'লিল, সরোজ তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, "তুই যদি আমাদের বউয়ের সতীনও হ'স্, তাহ'লে আমি দাদাকেও ছেড়ে কথা ক'ব না।"

হেমলতা সজোরে তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "আর ব'লবি?—আর ব'লবি?"—

হেমলতার বড় দোষ, কথায় না পারলেই গাল টিপিয়া ধরে।

সরোজের সেই আরক্তিম গণ্ডদ্বয় হেমলতার উৎপীড়নে আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; সে হাসিতে হাসিতে তাহার হস্ত ছাড়াইয়া বলিল, "কেন, আমার সঙ্গে লাগ কেন ?"

এইরূপে দুই সইতে হাস্য-পরিহাস হইতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদবর্ণিত ঠাকরুণ-দিদির "দূতী" আসিয়া হেমলতাকে অবিলম্বে রান্নাঘরে যাইবার হুকুম জারি করিল সুতরাং হেমলতা সরোজকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। তখন ঠাকরুণ-দিদি হেমলতাকে উদ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওলো ! এক কাজ কর, ঐ ওখান থেকে একমুটো চাল নিয়ে ঐ উননের হাঁড়ি ক'টার মধ্যে, যেটায় হোক, ফেলে দে।"

হেমলতা কিছুই ইহার ভাব বুঝিল না ; কিন্তু ভয়ে ভয়ে এক মুঠা চাউল লইয়া একটা হাঁড়িতে ফেলিয়া দিল,—সর্ব্বনাশ ! ঘর-সুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ, পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাহি করিতে লাগিল ; কাহার মুখে কথা নাই, সকলেই নিষ্পন্দ, অবাক্ !—হেমলতা প্রবোধের হাঁড়িতে চাউল দিয়াছে !

দিগম্বরী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল ; কিন্তু আর থাকিতে পারিল না ; সহসা তাহার সানুনাসিক রোদনের ফোয়ারা ছুটিয়া গেল ! হেমলতা অবাক্ হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিল, কারণ কিছুই বুঝিল না। সরোজ তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং বলিল, "নেকি ! বুঝ্লিনে ? তোর বরের ঠিক ক'র্‌লে।"

তৎপরে কে তাহার বর হইবে,—পরীক্ষার ফল কি হইল,—তাহা তাহাকে বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

হেমলতা তখন সজোরে তাহার খোঁপা ধরিয়া এক টান দিল। সরোজের সাধের খোঁপা খুলিয়া গেল।

সরোজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "মরণ তোমার! খোঁপা খুলে দিলি? চল্, আবার তোকে তেমনি ক'রে বেঁধে দিতে হবে." বলিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে উপরে লইয়া গেল।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

## সখা-সন্নিধানে।

যোগেন্দ্রনাথের বহির্বাটীর একটী প্রকোষ্ঠে দুইজন যুবাপুরুষ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। উঁহাদিগের মধ্যে একজন যেন ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন। বদন অতিশয় বিষণ্ণ, দৃষ্টি অবনত, দেখিলেই বোধ হয়, যেন তিনি আপন অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষম সংগ্রামে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

দ্বিতীয় যুবকটীও চিন্তাকুল। কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে এক এক-বার সতৃষ্ণ নয়নে সঙ্গীর মুখ পানে চাহিতেছেন, আর এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিম্ন-দৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপে বহু-ক্ষণ গত হইল। পরে প্রথম যুবক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দ্বিতীয় যুবার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। নিশ্বাসটী যেন তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কোন বিষম যন্ত্রণার গুরুভাগটী সবলে টানিয়া লইয়া বহির্গত হইল!

দ্বিতীয় যুবক যেন এই নিশ্বাসশব্দে চমকিত হইয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি স্থির করিলে ?”

“আমার মতে তুমি সেখানে না যাইলেই ভাল হয়। তোমার মনের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে ভয় হয় পাছে”

যোগেন্দ্রনাথ কথা সমাপ্ত করিলেন না ; কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বুঝিলেন, বুঝিয়া একটু হাসিলেন। তাঁহার সে হাস্যে যেন অন্তরের যাতনা ফুটিয়া উঠিল ! বলিলেন, “ভাই যোগেন্দ্র ! তুমি কি ভাবিয়াছ আমার মন এতই দুর্ব্বল ? হেমলতা উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্তা হইবে,—সুখশালিনী হইবে। তাহা কি আমি দেখিতে পারিব না ? তবে আর আমার ভালবাসা কি ? তাহা হইলে আর আমার প্রণয় কি ? যে ব্যক্তি ভালবাসার ধনকে সুখী দেখিতে পারেনা, মনে ক্লেশ অনুভব করে, তাহার সে ঘোর স্বার্থপর ভালবাসা—স্বার্থপর প্রণয়কে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি ! আমি জানি, হেমলতার যেখানে বিবাহ হইতেছে তাঁহারা অতিশয় সম্ভ্রান্ত, অতিশয় ধনবান, —হেমলতা অবশ্যই সুখে থাকিবে। আমার ন্যায় দরিদ্র কি তাহাতে সে সম্পদ, সেরূপ যত্ন কখন দিতে পারিবে ? হেমলতা দেবী ;— আমার ন্যায় হতভাগ্য কি সেই পবিত্র মূর্ত্তির পূজা করিবার অধিকারী ? আমি নির্ব্বোধ, উন্মাদ, তাই না বুঝিয়া, আপনা ভুলিয়া, এতদিন সেই দেবীর উদ্বোধন করিতেছিলাম ! একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই যে, সেই সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিব না। ভাই, তোমার নিকট আমার মনের কথা কিছুই গোপনীয় নাই। হেমলতার মন আমি বিশেষ জানি, তাহার অন্তর স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল। তাহাতে একদিন এই হতভাগ্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, এবং

আজিও তাহা সেইরূপ, সেই ভাবে, সেইখানেই প্রতিফলিত আছে। কিন্তু আমি যে দিন হইতে জানিলাম যে, হেমলতা আমার হইবেনা, এ স্বর্গীয় সুখ-স্বপ্ন নিশ্চয়ই ভঙ্গ হইবে, সেই দিন হইতে সেই ছবি তাহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আর ভ্রমক্রমেও তাহাকে দেখা দিতাম না, যখন আমার দুর্ব্বল মন—উন্মত্ত হৃদয়—তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইত, তখনই বিষম যুদ্ধ বাধাইয়া দিতাম! এই সময় এক দিন ঘটনাক্রমে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম, সহসা হেমলতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া মন যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল, হৃদয় নাচিতে লাগিল, ক্ষণকাল আপনাকে ভুলিয়া গেলাম, পৃথিবী ভুলিয়া গেলাম—বোধ হইল যেন, কোন অপ্সরা-কণ্ঠ নিঃসৃত বীণা-স্বরলহরী আমার হৃদয়ে ঝঙ্কার দিতেছে! কিন্তু পরক্ষণেই আমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হইল, —আপন দুর্ব্বলতা বুঝিলাম মনকে শত ধিক্কার দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিলাম। ইহার কিছুদিন পরে হেমলতার সহিত "মহাভৈরবের" মন্দিরে যাইয়া দেবসাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলাম,—আমাকে, আমাদের মধ্যে যাহা কিছু সমস্তই, বিস্মৃত হইতে কহিলাম—হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে প্রণয়-তরুকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে বলিলাম। কিন্তু হেমলতা আমার কথা শুনিল না, প্রতিজ্ঞা করিল না,—আমি বিরক্ত হইয়া কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিলাম, তথাপি সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইল না, আমি ক্রোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। বুঝিয়াছিলাম, আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, এ পৃথিবীতে কষ্ট সহিতে আসিয়াছি, কষ্ট সহিয়াই চলিয়া যাইব, তবে যাহাকে ভালবাসি,

যাহাকে অন্তরের সহিত পূজা করি, তাহাকে,—আমার প্রাণের হেম-লতাকে কেন ক্লেশ দিব?—ভাই! দেখিতেছ, এখনও আমি আমার পাগল মনকে সম্পূর্ণরূপে বশে আনিতে পারি নাই; এখনও আমি হেমলতাকে "আমার প্রাণের হেমলতা" বলিতেছি! হেমলতা আমার? হাঁ, 'আমার' হৃদয়ের হেমলতা চিরকালই আমার হৃদয়ে থাকিবে, চিরকালই মন আমার উপাস্য-দেবীর ন্যায় সেই মূর্ত্তির পূজা করিবে! ভাই! উন্মত্ত মনে হৃদয়-দ্বার উদঘাটন করিতে করিতে তোমার কাছে কত প্রলাপ বকিলাম; ক্ষমা করিও! কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম—চল, আমি অবশ্যই সেখানে যাইব,—অবশ্যই হেমের বিবাহ দেখিব,—তাহাকে উপযুক্ত পাত্রে বরমাল্য অর্পণ করিতে দেখিয়া সুখী হইব। আর—আর একবার মাত্র জন্মের মত হেমলতাকে শেষ দেখা দেখিয়া লইয়া এ দগ্ধ হৃদয় জুড়াইব।"

বলিতে বলিতে প্রবোধচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "ভাই! এ দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিও, আমি হৃদয়কে আর বশে রাখিতে পারিতেছি না।"

যোগেন্দ্রনাথ উভয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে আলি-ঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমিই যথার্থ প্রণয়ী! এ পৃথিবীতে কেবল তুমিই প্রণয়ের সার মর্ম্ম বুঝিয়াছ। আমরা তোমার নিকট শতবর্ষ শিক্ষালাভ করিতে পারি। তুমি দেবতা, নতুবা মনুষ্য এরূপ স্বর্গীয় প্রণয় কেমন করিয়া জানিবে?"

---

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

## আশা ফুরাইল।

আজ কন্দর্পপুরে মহা ধূম! শিবপ্রসাদের বাটীতে লোকে লোকারণ্য। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল,—সকলেই শশব্যস্তে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—আজ হেমলতার বিবাহ। তারাচাঁদ বীরনগরের যে পাত্রের কথা বলিয়াছিল, তাহারই সহিত বিবাহ হইবে।

বেলা অপরাহ্নপ্রায়। বর, বর-যাত্র প্রভৃতি সকলেই শিবপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত,—আনন্দ-উৎসবে,—কন্দর্পপুর উথলিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এ সময় তারাচাঁদ কোথায়? তিনি অনেকক্ষণ বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এখনও দেখা নাই কেন? তারাচাঁদ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি আসিতেছেন,—তাঁহার কোলে একটী শিশু. কিঞ্চিৎ অগ্রে অপর এক বালক একটী শিশুর হাত ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। তারাচাঁদের দক্ষিণ হস্তের একটি

অঙ্গুলি ধরিয়া অপর একটী বালক টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে চলিতেছে এবং পশ্চাতে কিছুদূরে আরও দুইটী উলঙ্গ শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এক একবার দৌড়িতেছে, আর রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, আবার উঠিয়া ছুটিতেছে!—বলা বাহুল্য এই গুলি সমস্তই আমাদের পুণ্যবান তারাচাঁদের ভীষণ "পুন্নাম-নরকের" ত্রাণ-কর্ত্তা;—তথাপি "পঞ্চম" শিশুটি অসুখ-বিধায় আসিতে পারে নাই!

তারাচাঁদ এক একবার অগ্রসর হইতেছেন, আর এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া রোদন-পরায়ণ বালকদ্বয়ের প্রতি তীব্র গালি বর্ষণ করিতেছেন! তাহারা চলিতে পারিতেছেনা—তাঁহার বিবাহ বাটীতে যাইতে বিলম্ব হইতেছে, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। তিনি বিষম ক্রোধে বালকগণের মাতাকে উদ্দেশ করিয়া অচিরাৎ নির্ব্বংশ হইবার আদেশ করিতেছেন। তাঁহার এখনকার মতে এরূপ অন্যায় রূপ বংশ বৃদ্ধির সমস্ত দোষই তাঁহার ব্রাহ্মণীর!

দিগম্বরীর চিরপোষিত মনের সাধ আজ পূর্ণ হইতে বসিয়াছে, সুতরাং তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি যেন একা এক সহস্র হইয়াছেন, তিলমাত্র বিশ্রাম নাই, কেবল এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন, এবং "তুমি এ কর; তুমি ও কর," বলিয়া নানা জনকে নানাপ্রকার আদেশ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাতঃকাল হইতে অনবরত চীৎকারে এক্ষণে তাঁহার স্বরভঙ্গ হওয়ায় সকল কথা স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না। কর্ম্মবাড়ীর কর্ত্রীর উপর দেবতার যেন কি কোপ আছে! কর্ম্মের দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গলাটী ভাঙ্গিতেই হইবে। যে দিগম্বরীর দেবদত্ত পাঞ্চজন্যের সুগম্ভীর নিনাদে

কন্দর্পপুরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়, হায়! আজি বিধিবিড়ম্বনায় সেই স্বর অস্পষ্ট—অস্ফুট--ইহাতে কে না দুঃখিত হইবে?

দিগম্বরী সেই অস্ফুট ভাঙ্গা গলায় এক এক জনকে এক একটী কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেছেন; যাহার ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন সেই তাঁহার সেই নীরব ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেছে; কিন্তু যাহার কপাল মন্দ, সে শত বারেও তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতেছে না, সুতরাং দিগম্বরী যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া সে যে একটী বদ্ধ-কালা,—ঢাক বাজাইলেও শুনিতে পায় না,-সে বিষয়ে সহস্র প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

কিন্তু অভাগিনী হেমলতা এখন কোথা,—কি করিতেছে? আজিকার এই মহাযজ্ঞে তাহার হৃদয়ের হৃদয় উৎসর্গীকৃত হইবে,—জীবনের সকল আশা—সকল ভরসা—ইহজন্মের মত ফুরাইয়া যাইবে, সে কি তাহা বুঝিতে পারে নাই?

হেমলতা দ্বিতলের একটি কক্ষে নীরব নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছে, নিকটে সরোজ এবং আরও কয়েকটী সমবয়স্কা বসিয়া পরস্পর হাস্য কৌতুক করিতেছে। বরকে কিরূপ তামাসা করিতে হইবে, কি উপায়ে তাহাকে নিশ্চয়ই ঠকাইতে পারা যাইবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে পরামর্শ হইতেছে। কিন্তু হেমলতা এ সকল কিছুই শুনিতেছে না। তাহার হৃদয়মধ্যে যেন তুমুল ঝটিকা বহিয়া মহা-প্রলয় উপস্থিত করিতেছে। বিবাহের আনন্দোৎসব যেন তাহার কর্ণে সহস্র বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাতনার সীমা নাই,—এক একবার বোধ হইতেছে যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া সেই অনন্ত

যন্ত্রণারাশি বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে। বার বার চক্ষু ফাটিয়া প্রবল বেগে অশ্রু-প্রবাহ বিনির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। অভাগিনী অনেক কষ্টে বামহস্ত খানি বুকের উপর দিয়া যেন হৃদয়কে প্রশান্ত হইবার জন্য অনুনয় করিতেছে, আর চক্ষুর জল চক্ষে মিশাইতেছে। কতবার—হায়! কতবার ভাবিতেছে যে দৌড়িয়া গিয়া দিগম্বরী ও শিবপ্রসাদের পায়ে ধরিয়া এ বিবাহ স্থগিত করিতে বলিবে। হৃদয় চিরিয়া তাহার অনন্ত যন্ত্রণারাশি একে একে দেখা-ইয়া দিবে, আর সেই সঙ্গে তাহার হৃদয়ের ইষ্ট দেবতাকেও দেখাইবে। পিতা তাহাকে এত ভালবাসেন, এখন কি তাহার এ রোদনে কর্ণপাত করিবেন না? তাহার মুখের দিকে চাহিবেন না? পিসিমা এত স্নেহ করেন, এখন কি তাহার প্রতি এত কঠিন হইবেন? তাহার এ চক্ষুর জল—হৃদয়-ভাঙ্গা চক্ষুর জল—দেখিয়া কি মুখ ফিরাই বেন? তাহা যদি হয়, তবে পিতার চরণে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে, "বাবা গো! তোমার হেমা—তোমার প্রাণের একমাত্র হেমাকে বাচাও, তোমার জন্ম-দুঃখিনী হতভাগিনী হেমলতার মুখ-পানে একবার চাও,—এ বিবাহ দিও না। আমার মা নাই, তা' বলিয়া কি তুমি আমার দুঃখ বুঝিবেনা? বাবা! তোমার হেমাকে কি তুমি এইরূপ চিরকালের জন্য কাঁদাইবে? মাগো! এসময় একবার তোমার চিরদুঃখিনী হেমলতাকে দেখ,—দেখ মা, আজ তাহার কি সর্ব্বনাশ হইতেছে! মা ভিন্ন মেয়ের যাতনা আর কে বুঝিবে?"

অভাগিনী আর থাকিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হৃদয় দৃঢ়, মুখে সেই দৃঢ়তার চিহ্ন প্রতিফলিত হইল! এইবার যাইয়া

পিতার নিকট সকল কথা বলিবে, আর সময় নাই,—বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে,—সন্ধ্যার পরেই তাহার সর্ব্বনাশ হইবে,—তাহার সকল আশা ফুরাইয়া যাইবে। তাহার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল, নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল, শরীরের শোণিতস্রোত প্রবল হইয়া উঠিল। হেমলতা যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু পারিল না; সহসা যেন কোন অলক্ষিত গুরুদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে হতচেতন হইয়া বসিয়া পড়িল।

এই সময়ে বহির্বাটীতে গভীর নিনাদে বাদ্য বাজিয়া উঠিল; প্রত্যেক শব্দ যেন অভাগিনীর হৃদয়মধ্যে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিতে লাগিল। ভাবিল একবার প্রাণ ভরিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া এ যন্ত্রণার উপশম করিবে, কিন্তু তাহাও পারিল না।

হেমলতে! এ কি? তোমার সেই প্রতিজ্ঞা—সেই চন্দ্রিকা-বিধৌত সুগভীর রজনীতে, সেই পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর সমক্ষে তোমার সেই প্রতিজ্ঞা—আর সেই ভীষণ দেবমন্দিরে সেই সর্ব্বসাক্ষী দেবতার সম্মুখে সেই প্রার্থনা, এখন কোথায় রহিল? কৈ হেমলতে! তোমার হৃদয়ের সে বল কোথা?

* * *

ক্রমে বেলা অবসন্ন হইয়া আসিল; গোধূলি লগ্নে বিবাহ। লগ্ন উপস্থিত, বর কন্যা উভয়েই বিবাহস্থলে আনীত হইল এবং উভয়কেই পৃথক্ পৃথক্ আসনে পরস্পরের পাশাপাশি বসান হইল; পুরোহিত মন্ত্র বলিতে লাগিলেন, বর-কন্যার হস্ত একত্র করা হইল এবং একগাছি কুসুমমালা দ্বারা সেই হাত দুইটা বাঁধা হইল; শিবপ্রসাদ কন্যা সম্প্রদান করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চকণ্ঠে হুলুধ্বনি হইল। যদি কেহ সে সময় হেমলতার প্রতি লক্ষ্য করিত,

তবে দেখিতে পাইত যে, সেই কুসুম-মালা-বন্ধনের মধ্যে অভাগিনীর হাতখানি ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।

বিবাহস্থলে প্রবোধচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। প্রবোধচন্দ্র এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না, সহসা তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল; বোধ হইতে লাগিল যেন, পৃথিবী ভীষণ আবর্ত্তে তাঁহার পদতলে ঘুরিতেছে। তিনি আর দেখিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। যোগেন্দ্রনাথ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, চকিতের ন্যায় আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সে রাত্রিতে কেহ আর তাঁহাদিগকে সেখানে দেখিতে পাইল না।

বিবাহ হইয়া গেল,—বর-কন্যা বাসর ঘরে গিয়া বসিল। হেমলতার সমবয়সীরা উভয়কে ঘিরিয়া বসিয়া নানারূপ কৌতুক করিতে লাগিল। অভাগিনী হেমলতা তখনও ভাবিতেছে, "কাহার বিবাহ হইল,—আমার? আমার ত হৃদয়ের বিবাহ অনেক দিন হইয়া গিয়াছে,—তবে এ কি শরীরের বিবাহ?"

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

## উদ্ভ্রান্ত চিত্তে।

আজি এক পক্ষ অতীত হইল, প্রবোধচন্দ্রের মাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। উপর্য্যুপরি অসহনীয় শোক-তাপে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছিল,—অতঃপর তাঁহার অন্ধের যষ্টি, অমান্ধকারের একমাত্র ক্ষীণ তারা, প্রবোধচন্দ্রকে রাখিয়া কিরূপে দেহত্যাগ করিবেন, এই চিন্তাতেই তিনি অনুক্ষণ ব্যাকুলা ছিলেন,—এতদিনে তাঁহার সে চিন্তার অবসান হইয়াছে, তাঁহার মনের অন্তিম সাধ মিটিয়াছে, তিনি যোগেন্দ্রনাথের মাতার হস্তে প্রবোধচন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রের দুঃখের কিন্তু ইয়ত্তা নাই; এই বিস্তীর্ণ সংসারে তিনি এখন একাকী। এতদিন যোগেন্দ্রনাথ নিকটে ছিলেন, তাঁহার সান্ত্বনা-

বাক্যে প্রবোধের মন অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়াছিল। গত কল্য তিনিও কলিকাতায় গিয়াছেন, সুতরাং আজ প্রবোধ চন্দ্রের মন খুলিয়া কথা কহিবার লোক নাই—তাঁহার হৃদয় শূন্য, অন্তর ব্যথিত, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত। একাকী নির্জ্জনবাসে প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তাই ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন।

বেলা অপরাহ্ন। পশ্চিম গগনে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম রশ্মিজাল অনুপম শোভা বিস্তার করিয়াছে। সেই অপরূপ ছবির প্রতিচ্ছায়া জাহ্নবীর প্রশান্ত বক্ষে পতিত হইয়া আরও মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। মৃদু মন্দ বায়ু বহিতেছে, সেই পবনহিল্লোলে জাহ্নবী-বক্ষে অসংখ্য লহর-মালা দুলিয়া দুলিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া সেই শোভার পূর্ণ বিকাশ সম্পাদন করিতেছে।

প্রবোধচন্দ্র অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে স্বভাবের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য-রাশি সন্দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে এক অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল।—একদিন, এইস্থানে, ঠিক এমনি সময়ে, প্রকৃতির এইরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে, এক নববিকশিত শ্বেতপদ্মের ন্যায় বালিকা তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইয়াছিল; আজি যেন সেই বালিকা আবার অধরপ্রান্তে মধুর হাসি হাসিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেকের জন্য তিনি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল,— তিনি যেন সেই ফুল্লেন্দীবর তুল্য নয়নযুগল, সেই হাস্যোৎফুল্ল বদনমণ্ডল, সেই আরক্তিম গণ্ডদ্বয় নিরীক্ষণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন! কিন্তু হায়! পরক্ষণেই তাঁহার সে স্বপ্ন ভগ্ন হইল, অন্তরের অন্তস্তল

হইতে একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল, তিনি আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

অদূরে ভীষণ শ্মশান ধূ ধূ করিতেছে। প্রবোধচন্দ্র সেদিন ঐ মহাশ্মশানে তাহার জননীকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছেন। আজি ঐ শ্মশানের শূন্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় আরও শূন্য হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যেন, শ্মশানভূমি বিকট মুখভঙ্গী করিয়া, অট্ট হাসি হাসিয়া, তাঁহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিতেছে! তিনি সেদিকেও আর চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না,—বীচিবিক্ষুব্ধ গঙ্গাবক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িতে উড়িতে—এক একবার জাহ্নবীর সলিল স্পর্শ করিতেছে, আর ঊর্দ্ধে উঠিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে মৃদু-মধুর ঝঙ্কার দিয়া আকাশ ভাসাইতেছে! -পক্ষীটি ক্রমান্বয়ে এই রূপ উঠিয়া পড়িয়া গাহিয়া গাহিয়া যাইতে লাগিল, প্রবোধচন্দ্রের দৃষ্টি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শেষে পাখিটি কিছু দূরে একখানি পাইল-ভরা নৌকার অন্তরালে পড়িল।—তিনি দেখিলেন নৌকাখানি রাজহংসীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া, তিনি যে ঘাটে দাঁড়াইয়া আছেন. সেই ঘাটের দিকে আসি-তেছে।—তিনি চাহিয়া রহিলেন। অবিলম্বে নৌকা ঘাটে লাগিল. দুই জন সুসজ্জিত বরকন্দাজ তাড়াতাড়ি নামিয়া তীরে দাঁড়াইল, মাঝিরা সসম্ভ্রমে নৌকা হইতে কতকগুলি সিন্দুক-বাক্স তীরে উঠাইল; পরে সবল ও সুদৃঢ়কায় এক যুবাপুরুষ ও তৎপশ্চাৎ দাসী সমভিব্যাহারে এক অবগুণ্ঠনবতী যুবতী নৌকার অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইলেন।

প্রবোধচন্দ্রের হৃদয় দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল। তিনি অনিমিষ

লোচনে সেই অবগুণ্ঠনবতী তরুণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নৌকা-রোহীরা কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া সোপানাবলী অতিক্রম পূর্ব্বক গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। যুবতী সকলের পশ্চাতে ছিলেন, তিনিও অদৃশ্যা হইলেন; তথাপি প্রবোধের নয়ন ফিরে না,—পলক পড়ে না—তিনি অতৃপ্ত নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন,—হৃদয়ে যেন প্রলয়ের তুফান বহিতে লাগিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি উচ্চরবে বিকট হাসিয়া উঠিল. তিনি শিহরিয়া চাহিয়া দেখেন, শ্যামাচরণ!

শ্যামাচরণ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, "আহা! হেমলতা কি নিষ্ঠুর। একবার ফিরিয়াও চাহিল না! আগে যাহার সঙ্গে এত ভালবাসা ছিল, এখন বড়মানুষের গৃহিণী হইয়া একেবারে সমস্তই ভুলিয়া গেল!"

প্রবোধচন্দ্র সরোষে কহিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠ! তোমার নরকেও স্থান হইবে না।"

শ্যামাচরণ অধিকতর উচ্চ হাঁসিয়া কহিল. "হাঁ তার সন্দেহ কি? আমরা পাপী, আর তোমরা পুণ্যবান দেবতা! তোমাদের সব দেবলীলা, আর আমাদের সমস্তই পাপের খেলা।"

প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন পাপিষ্ঠের সহিত কলহ করা নিষ্ফল; তিনি আর পুনরুক্তি না করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আসিতে আসিতে তিনি আর একবার পাপিষ্ঠের বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক উচ্চ হাস্য শুনিতে পাইলেন।

বাটী আসিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিলেন। পরিশেষে কাগজ-কলম-মসী লইয়া কাহাকে পত্র

লিখিতে লাগিলেন। লেখা সমাপন করিয়া আপন মনে তাহা পাঠ করিলেন।

"ভাই যোগেন্দ্র,

বহুকষ্টে হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়াও তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। এ সংসারে আমার শান্তি দুর্ল্লভ! সংসারের কুটিল হাস্য আর সহ্য হয় না। তাই আজ জন্মের মত সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম। ভাই. তুমি এ হতভাগ্যের নাম বিস্মৃত হও। সংসার আমায় উদাসীন করিয়াছে, এই উদাসীন বেশেই বিদায় লইলাম। তোমার প্রণয়ের ঋণ অপরিশোধ্য—আমি নরাধম, আমাকে ক্ষমা কর।—

তোমার চিরপ্রণয়াবদ্ধ মহাপাপী প্রবোধ।"

পত্রখানি বন্ধ করিয়া, যোগেন্দ্রনাথের কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ডাকে দিয়া আসিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া, কয়েকটী প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া অবিলম্বে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অজস্রধারে গণ্ড বহিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল; প্রবোধচন্দ্র উদাসপ্রাণে, উদ্ভ্রান্তচিত্তে, শূন্যদৃষ্টিতে, আর একবার আপনার বাটীর দিকে চাহিয়া, ত্বরিতপদে কন্দর্পপুর পরিত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রি হইতে আর কেহ তাঁহার সন্ধান পাইল না।

# বিংশ পরিচ্ছেদ।

## তরঙ্গসঙ্গে।

উল্লিখিত ঘটনার কয়েক দিবস পরে একদিন সায়াহ্নে পদ্মাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাসিতে ভাসিতে ঢাকা অভিমুখে যাইতেছে। বৈশাখ মাস। পদ্মাবতীর এখন আর সে প্রাবৃটের ভীষণ দর্প নাই, সেই রুদ্রতালে নৃত্য নাই, সেই প্রলয়ঙ্করী উন্মত্ততা নাই;—এখন যেন জরাজীর্ণা বর্ষীয়সীর ন্যায় অতি ক্ষীণ মৃদুগতিতে নিঃশব্দে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে।

প্রদোষ কাল। ধীর নৈদাঘ বায়ু মৃদু মৃদু সঞ্চালিত। সান্ধ্য তপনের ক্ষীণরশ্মি পদ্মাবক্ষে প্রতিফলিত। প্রকৃতির প্রশান্ত ভাব সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত। নৌকাখানি মরালগতিতে পদ্মা-সলিল ভেদ করিয়া চলিয়াছে। নৌকার নিরক্ষর মাঝি নিসর্গশোভায় বিভোর হইয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে দিগন্তস্পর্শী গান ধরিয়াছে:—

ভাটিয়াল সুর।

"কাল রূপ আর হের্‌ব না ;
যে পথে কালা চলে সে পথে পা দিব না।
কাল রূপ ঘেন্না করি ; প'র্‌বোনা নীলাম্বরী,
কালি মাখা ভাতের হাঁড়ি, সে হাঁড়ির ভাত খাব না।
যমুনার কাল জল,
সে জলে গা ধোব না !"—

মাঝির গানের তালে তালে নৃত্য করিয়া নৌকা চলিতেছে। নদী-হৃদয়ের ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিও যেন সেই তালে তাল মিলাইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে।

নৌকার অভ্যন্তরস্থ একমাত্র আরোহী কিন্তু এ সকল বিষয়েই উদাসীন। গানে কাণ নাই, স্বভাব-শোভায় দৃষ্টি নাই, বাহ্য ব্যাপারে মন নাই। তিনি স্থির ধীর নিশ্চল ভাবে কি এক অব্যক্ত চিন্তায় বিভোর।

সহসা গান থামিল। এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সূর্য্যমণ্ডল গ্রাস করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে ঘোর ঘন ঘটায় সমগ্র আকাশ আচ্ছন্ন হইল। বায়ুর বেগ প্রবল হইল। তরঙ্গ-রঙ্গ আস্ফালিয়া উঠিল। নাবিকের মুখ ম্লান হইল। সে প্রাণপণ শক্তিতে কর্ণ ধারণ করিয়া তটাভিমুখে তরি লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইল ; অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল ; ঝড়ের বেগ বর্দ্ধিত হইল ; বজ্রনাদে দিগন্ত নিনাদিত হইল। নৌকা যায় যায় হইল। আরোহীকে তখনও নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মাঝি জড়িতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে

সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবু, শীঘ্র বাহির হউন, নৌকা আর রক্ষা' হয় না।"

আরোহী যুবাপুরুষ। মাঝির কথায় তাঁহার ভাব-নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; তিনি শিহরিয়া উঠিয়া নৌকার বাহিরে আসিলেন, এবং তৎ-কালীন অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন, এ পৃথিবী আজ তাঁহার পক্ষে শেষ দেখা।

এই সময়ে একটী প্রবল তরঙ্গাঘাতে নৌকাখানি উলটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। মাঝি তখনও সবলে হাইল চাপিয়া তরঙ্গ কাটাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যেমন জোর দিল অমনি হাইলের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, মাঝি সামলাইতে না পারিয়া বেগ-ভরে নদী-গর্ভে পতিত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে নৌকাখানিও উলটিয়া পড়িল। সেই প্রবল বায়ু-তরঙ্গ ভেদ করিয়া, সেই ভীষণ মেঘগর্জ্জন অতিক্রম করিয়া, তখন নদীগর্ভ হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইল—

"পড়িয়ে ভব-সাগরে ডোবে মা তনুর তরি !"

একবার মাত্র এই শব্দ শুনা গেল, দ্বিতীয়বার আর শ্রুত হইল না।

যুবা তরঙ্গের সঙ্গে যুঝিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল, হস্ত-পদের ক্রিয়া-রোধ হইল, জ্ঞান-শক্তি লুপ্ত হইল। এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে জলমধ্যে চাপিয়া ধরিল।

আজি বুঝি হতভাগ্য যুবকের জীবন-স্রোত পদ্মার অনন্ত স্রোতে মিলাইয়া গেল।

* * * *

ঐ ঘটনার চারি দিবস পরে ঢাকা হইতে প্রকাশিত কোন

সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ যোগেন্দ্রনাথের নয়নগোচর হইল :—

"বিগত ৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্ন সময়ে যে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হয়, তাহাতে পদ্মা-গর্ভে একখানি নৌকা নিমগ্ন হইয়াছে। উহাতে দুই জন নাবিক ও একজন মাত্র আরোহী ছিল। একজন মাঝি ভিন্ন অপর দুই ব্যক্তিই জীবন হারাইয়াছে। নাবিকদ্বয়ের মধ্যে যে বাঁচিয়াছে, সেই ব্যক্তি পরদিবস নিকটস্থ থানায় গিয়া ঐরূপ সংবাদ দিয়াছে। সে কহিয়াছে, আরোহী কলিকাতা বা তন্নিকট-বর্ত্তী কোন গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় সে এইরূপ অনুমান করিয়াছে।"

প্রবোধচন্দ্রের পত্র পাওয়া অবধি যোগেন্দ্রনাথ বিধিমত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পান নাই। আজ এই সংবাদে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল নৌকারোহী প্রবোধ ভিন্ন অপর কেহ নহে। এ সংবাদ রঞ্জিত হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ও ক্রমে কন্দর্পপুরে এবং বীরনগরে হেমলতার কর্ণে পৌঁছিল। সকলেই স্থির করিলেন প্রবোধচন্দ্র তরঙ্গ-সঙ্গে ইহসংসারের পর-পারে গিয়াছেন।

ক্রমে দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল। প্রবোধচন্দ্রের কথা সকলেই বিস্মৃত হইল; কেবল ভুলিল না দুই জন—মহাপুরুষ যোগেন্দ্রনাথ আর অভাগিনী হেমলতা। কাল-তরঙ্গে তাহাদিগের জীবন তরঙ্গ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, তরঙ্গ-সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের চির সমাধির কথা তাহাদিগের হৃদয়-মন্দিরে ততই যেন সজাগ হইয়া উঠিল।

---

# একবিংশ পরিচ্ছেদ।

## প্রতিঘাত।

বীরনগরের কোনও অট্টালিকার এক কক্ষ-বাতায়নে একটী রমণী বসিয়া আছে। বয়স আনুমানিক বিংশতি বৎসর। রূপ-সরোবরে তুফান বহিতেছে—মুখ-পদ্মটী ঢল ঢল করিতেছে!—কিন্তু পাঠক, যদি আপনি "রূপ-জহুরী" হন, তবে দেখিতে পাইবেন, রমণীর নয়ন-কোণে কালিমা রেখা, ভ্রূ-মধ্যে কুঞ্চন চিহ্ন, শীর্ণ শরীরে কাল কাল শিরা। দেখিলেই বোধ হয়, রমণী দারুণ বিষাদ-যাতনায় জর্জ্জরীভূতা!

যুবতী বাতায়নপথে বসিয়া করতলে বামগণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক কি ভাবিতেছে। একটী শিশু গৃহমধ্যে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

যুবতীর এদিকে দৃষ্টি নাই। অন্যমনে শূন্যনয়নে শূন্য আকাশ পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছে। সহসা দেখিল একস্থানে কতকগুলি কপোত বসিয়া আছে। উহাদের কিঞ্চৎ দূরে একটি কপোতী। কপোতগুলি একে একে ধীরে ধীরে, সেই কপোতীর নিকটে যাইয়া

রঙ্গে ভঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, কতরূপ ভাব ভঙ্গি দেখাইয়া কত প্রকারে তাহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। তালে তালে মধুর কণ্ঠে গীতি গাহিয়া তাহার চিত্তহরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু কপোতী কিছুতেই ভুলিতেছে না। সে সেই স্থির ধীর অবিচলিত ভাবে বসিয়া আছে—দেখিয়া, কপোত-গুলি নিরস্ত হইয়া স্বস্থানে গেল। তখন কপোতী ধীরে ধীরে উঠিয়া, যে একটি কপোত উল্লিখিত কপোতগুলির কিছু দূরে বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া ছিল, তাহার নিকটে গেল, এবং কতপ্রকার সোহাগ করিয়া তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আপনার সেই ক্ষুদ্র চঞ্চুপুট দ্বারা ধীরে ধীরে তাহার গা খুঁটিয়া দিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার চঞ্চুপুটে আপন চঞ্চুপুট দিয়া সোহাগের চুম্বন প্রদান করিতে লাগিল।—দেখিতে দেখিতে কপোতের সেই বিষাদ ভাব অন্তর্হিত হইল, কপোতীর সেই হৃদয় ঢালা অমৃত সোহাগে আপন দুঃখজ্বালা ভুলিয়া গেল, নিমেষ মধ্যে প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল, এবং প্রিয়তমার অপার্থিব সোহাগের প্রতিদান করিতে লাগিল। কপোতী আহ্লাদে পুলকিত হইল, সুখরাশি যেন তাহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতে লাগিল, সে উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগে আত্মহারা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল! কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাকে এ আনন্দ, এ সুখ উপভোগ করিতে হইল না, নিষ্ঠুর বিধাতা তাহার সেই ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ে সহসা বজ্র নিক্ষেপ করিলেন! কোথা হইতে সহসা এক প্রকাণ্ড বিড়াল লম্ফ প্রদান করিয়া আসিয়া তাহার সেই হৃদয়ের ধনকে মুখে করিয়া লইয়া গেল! কপোতী ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল!

তাহার সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ যুবতীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। নিমেষ মধ্যে যেন কোনও অতীত স্মৃতি তাহার হৃদয়পটে পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল!—যেন ঐ সদ্যঃ অনাথিনী কপোতীর ন্যায় সে'ও একটী রত্ন হারা হইয়াছে; এ জীবনের মধ্যে একদিন—এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর তাহাকে দেখিবে না! রমণীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, ভাবিল, ছুটিয়া গিয়া সেই অভাগিনী কপোতীকে বুকে লইয়া তাহার সেই হৃদয়ভাঙ্গা তপ্ত অশ্রুজলের সহিত আপন অশ্রুজল মিলাইয়া দেয়—আর বলে, "যে আয় ভাই! এ পৃথিবীর সুখ বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে লেখেন নাই, আমরা এ পোড়া হৃদয়ে অনন্ত যাতনা সহিতেই আসিয়াছি, তবে আয়, আমরা দুজনে গলাগলি করিয়া বসিয়া কাঁদি! এ জীবনে, এ পাপ পৃথিবীতে আমরা কেবল কাঁদিতেই আসিয়াছি, কাঁদিয়া কাঁদিয়াই শেষ হইব!"

রমণী এইরূপে অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন হৃদয় কিঞ্চিৎ লঘু বোধ হইল। পরে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া পুনর্ব্বার শূন্য মনে, শূন্য আকাশ পানে চাহিয়া রহিল।—

সহসা গৃহদ্বার সবেগে উদ্ঘাটিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি গুরুদ্রব্য পতনের শব্দ হইল; শিশুটি সভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। রমণী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী! অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া পতির শুশ্রূষায় নিয়োজিত হইলেন। একজন দাসী আসিয়া রোরুদ্যমান শিশুকে লইয়া গেল। হেমলতা—অভাগিনী হেমলতা অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্বামীর সেবা করিতে লাগিল।

* * * *

যে গৃহে হেমলতার বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের বিষয়-বিভব অতুল। হেমলতার স্বামী সুরেন্দ্রনাথ একাকী সেই সমস্তের অধিকারী। হেমলতা সেই গৃহে একমাত্র কর্ত্রী। হেমলতা সুখিনী;—কিন্তু যে ভিতরের সংবাদ জানিত, সেই বলিত যে, তাহার ন্যায় ধনীর গৃহিণী হওয়া অপেক্ষা দরিদ্রের সহধর্ম্মিণী হওয়া সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয়! অভাগিনী হেমলতা আপনিও এই কথা ভাবিত—বলিত, "যদি হৃদয়কে বলি দিতেই হইল, তবে হে পরমেশ্বর, কেন আমাকে দরিদ্রের হাতে দিলে না?"

হেমলতা ঐশ্বর্য্য-সুখশালিনী হইয়াও কায়মনোবাক্যে কেন যে এই প্রার্থনা করিত তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

## অমৃতে গরল।

হেমলতার স্বামী সুরেন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে অপরিমিত বিষয় বিভবের অধিকারী। বিবাহের পর সে হেমলতাকে প্রথম প্রথম অত্যন্ত ভাল বাসিত। হেমের প্রেমহিল্লোলে স্নিগ্ধতা লাভ করিত। কিন্তু সংসর্গদোষে তাহার সে ভাব দূরীভূত হইল। তাহার পানদোষ ও তদানুষঙ্গিক অন্যবিধ ভয়ানক হীন আসক্তি-দোষ জন্মিল। সপ্তাহে ক্বচিৎ একদিন বাটী আসিত। যখন আসিত তখন ঘোর মদিরায় উন্মত্ত! হেমলতা কত অনুনয় বিনয়ে তাহাকে ঐ ভয়ঙ্কর অভ্যাস ত্যাগ করিতে বলিত; সুরেন্দ্র বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইত।

ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, তাহার পানাসক্তি ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই হেমের সহিত দেখা' সাক্ষাৎ বিরল হইতে আরম্ভ করিল।

আজ প্রায় দশদিবসের পর সুরেন্দ্র হেমলতার গৃহে যে অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর সুরেন্দ্রের একটু চেতনার সঞ্চার হইল, একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিল। হেমলতা এতক্ষণ সজল নয়নে, নীরবে তাহার সেবা করিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। স্বামীকে সজ্ঞান হইতে দেখিয়া তাহার দুঃখমিশ্রিত অভিমান-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সে পতির মুখের দিকে চাহিয়া অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র শূন্য দৃষ্টিতে রোরুদ্যমানা স্ত্রীর মুখপ্রতি চাহিল। হেমলতা ধীরে ধীরে কহিল, "এখন কি একটু সুস্থ বোধ হইতেছে?" সুরেন্দ্র জড়িত কণ্ঠে কি উত্তর করিল—হেমলতা বুঝিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিল। হেমলতা ধীরে ধীরে তাহাকে বসাইয়া দিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র বিরক্ত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল—পারিল না। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিরক্ত ভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। হেমলতা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সাহস করিল না। অভাগিনীর অমৃতে গরল হইল।
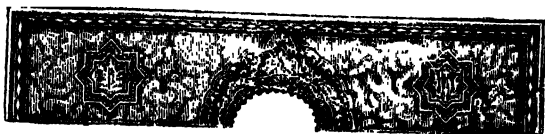
## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—∞—

### প্রতিমা বিসর্জ্জন।

সুরেন্দ্রের মদ্যপানাসক্তি দিন দিন অপরিমিত রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুর্ব্বল বাঙ্গালীর শরীরে এরূপ অত্যাচার আর কত সহ্য হইবে। সুরেন্দ্র নাথ অচিরাৎ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। রক্তাধার বিকৃত হইল—যকৃৎ পাকিয়া উঠিল; চিকিৎসক দেখিয়া বলিল, রোগ দুশ্চিকিৎস্য।

পীড়া যে সঙ্কটাপন্ন, অচিরেই তাহা জানা গেল। রোগী শয্যা-শায়ী হইল এবং রক্ত বমন করিতে লাগিল। শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল, এ অবস্থায় মুহুর্মুহুঃ মোহ হইতেও আরম্ভ হইল। তখন সুরেন্দ্রনাথ আপন অবস্থা বুঝিল এবং হেমলতার একখানি হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর রাখিয়া সজলনয়নে অতিক্ষীণ কাতর কণ্ঠে বলিল; "হেম! আমি চলিলাম; তোমাকে এ জীবনে কাঁদাইতেই আসিয়া-

ছিলাম—কখনও একদিনের জন্যও সুখী করি নাই। তোমার কথায়, তোমার উপদেশে, কখনও কর্ণপাত করি নাই। তোমার সেই অশ্রুসিক্ত কাতরতা মাখা মুখের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহি নাই। এখন তাহার প্রতিফল পাইলাম! তুমি দেবী—আমি নরাধম। আমি চলিলাম, জন্মের মত বিদায় হইলাম, আমার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিও; তোমার মনে অনেক কষ্ট দিয়াছি, তোমার ঐ কোমল হৃদয়ে অনেক ব্যথা দিয়াছি, কিন্তু মার্জ্জনা কর।" বলিতে বলিতে হতভাগ্য সুরেন্দ্রের দুই চক্ষু দিয়া ধারার পর ধারা বহিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তে আবার সে অতিশয় রক্ত বমন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হইয়া ঢলিয়া পড়িল, তৎপরে প্রাণপাখী নশ্বর দেহাগার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই বৃহৎ অট্টালিকা একটী ভীষণ শোকপুরীতে পরিণত হইল!

* * * * *

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই সরোজ শ্বশুরালয়ে আসিল। হেমলতার বাটীর অতি নিকটেই সরোজের শ্বশুরালয়—পাড়ান্তর মাত্র। সরোজ শ্বশুরালয়ে আসিয়া শৈশব সঙ্গিনী হেমলতার এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া শোকে আচ্ছন্ন হইল। সে মধ্যে মধ্যে পালকী করিয়া হেমলতার বাটীতে আসিত, এবং উভয়ে নীরবে ক্রন্দন করিত। সরোজ হেমলতার শিশুপুত্রটীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত, শিশুটীও তাহার অত্যন্ত অনুগত হইয়াছিল। হেমলতা সাধ করিয়া শিশুটীর নাম রাখিয়াছিল—'বসন্তকুমার'; সরোজ তাহাকে আদর করিয়া 'বসু বাবু' বলিয়া ডাকিত। বসু বাবুর কচি মুখের মন-ভুলান

গালভরা হাসি দেখিয়া হেমলতার সেই বিষাদ-বিশুষ্ক মলিন মুখেও হাসির রেখা দেখা দিত।

সরোজ মধ্যে মধ্যে এই শিশুকে আপনার বাটীতে লইয়া যাইত, এবং সমস্ত দিন নিকটে রাখিয়া, সোহাগ করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে দাসীর দ্বারা পাঠাইয়া দিত।

দাসী আশ্বিন মাসের একদিবস এইরূপ শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া হেমলতার বাটী যাইতেছে, হঠাৎ তাহাদিগের মাথার উপর শরতের এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। নিকটে কোন আশ্রয় ছিল না; দাসী বিশেষ চেষ্টাতেও বৃষ্টির ধারা হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে পারিল না; শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। সেই রাত্রিতেই তাহার অত্যন্ত জ্বর হইল, সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি দেখা দিল। হায়! সেই সর্দ্দিজ্বর কাল স্বরূপ হইল. বিধিমত চিকিৎসাতেও শিশু তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইল না,—তৃতীয় দিবসেই আভাগিনী হেমলতার অঞ্চলের নিধি তাহাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চিরদিনের জন্য সংসার ছাড়িয়া পলাইয়া গেল! অভাগিনীর হৃদয়-প্রতিমা চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জিত হইল।

হতভাগিনী হেমলতা সেই মৃতপুত্রকে বুকে লইয়া সেই ক্ষুদ্র কোমল মুখ খানির উপর মুখ দিয়া "বাবা আমার, আমায় ছাড়িস্ নে;—তোরে ছাড়্‌তে পারব না রে যাদু!"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কেহই তাহার কোল হইতে সেই মৃত শিশুটী কাড়িয়া লইতে সাহস করিল না। এমন সময়, 'কি হ'ল গো' বলিয়া সরোজ ছুটিয়া আসিয়া আছাড়িয়া পড়িল। "সরোজ রে, আমার প্রাণের বসন আমায় ছেড়ে গেছে রে সরোজ!" বলিয়া, হেমলতাও মূর্চ্ছিত হইয়া তাহার পার্শ্বে পতিত হইল।

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

### নদ-গর্ভে।

আজি অশোকাষ্টমী। হিন্দুর অতি পবিত্র দিন। দেশ-দেশান্তর হইতে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র সলিলে স্নান করিতে সমাগত হইয়াছে। এবার আবার বুধাষ্টমীর যোগ হইয়াছে।—সচরাচর ইহা ঘটে না—এজন্য যাত্রীর সংখ্যার অবধি নাই। এই সমস্ত যাত্রীর মধ্যে জন কয়েক বৃদ্ধের সঙ্গে একদল বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আসিয়াছেন; ইহাদিগের মধ্যে সকলেই প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা, কেবল একজন মাত্র তরুণী। যুবতী বিধবা, গৈরিকবসনা, রুক্ষকেশা, বিশুষ্কবদনা, অথচ পরমাসুন্দরী—দেখিলে বোধ হয়, গৈরিক বসনাদি দ্বারা তাঁহার রূপসাগরের প্রবল প্রবাহ রুদ্ধ করিতে যেন বৃথাই চেষ্টা করা হইয়াছে।

সচরাচর বাঙ্গালী যাত্রীরা ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার * সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন; কিন্তু উল্লিখিত যাত্রীরা স্নান সমাপনান্তে কামাখ্যাদর্শন-লালসায় কামরূপে আসিয়াছেন। তথায় নীলাচলে যোনিপীঠ দর্শন পূর্ব্বক গৌরীশিখরস্থ ভুবনেশ্বরী ও দশমহাবিদ্যাদি নানা দেবদেবী সন্দর্শন করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মপুত্র-গর্ভস্থ 'উমানন্দ' শৈলে যাত্রা করিলেন। উমানন্দদর্শনের পর অন্যত্র গমন পক্ষে তাঁহাদিগের এক বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল। দুই দিন অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ-মালা ভীষণ ভাব ধারণ করিল—বেলাভূমি জলে প্লাবিত হইয়া গেল।

তৃতীয় দিবসে বৃষ্টি থামিল, প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল, বর্ষান্তে চৈত্রের রৌদ্র দ্বিগুণ তেজে দেখা দিল। ব্রহ্মপুত্রের আস্ফালন কিন্তু কমিল না,—যেন রণোন্মত্ত মল্লবেশ ধারণ করিয়া রহিল! আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত যাত্রীরা পুনরায় দেবদর্শনে বহির্গত হইলেন। প্রথমে গৌহাটীর অদূরবর্ত্তী 'বশিষ্ঠাশ্রম' দর্শন করিয়া পরে ব্রহ্মপুত্রের পর পারে—গৌহাটীর উত্তরাংশে—'অশ্বক্লান্ত'† শৈলে যাত্রা করিলেন। ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে অনন্তদেবের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান। তথায় পূজার্চ্চনাদি সমাধা করিতে দিবা অবসিতপ্রায় হইয়া আসিল। রৌদ্র-তেজের হ্রাস হইলে তাঁহারা ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

* পদ্মার এই অংশ যমুনা নামে আখ্যাত।

† কথিত আছে, উষা-হরণের পর বাণ-যুদ্ধে আসিবার সময়ে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। এজন্য এই পর্ব্বতের নাম 'অশ্বক্লান্ত' হইয়াছে।

একে পার্ব্বতীয় পথ, অত্যন্ত বন্ধুর, তাহাতে সমস্ত দিন অনা-হার—অবরোহণ কালে স্ত্রীলোকদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যুবতীটার বড়ই শ্রান্তি বোধ হইল; তাহার পদে পদে পদ-স্খলন হইতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল, চলৎশক্তি প্রায় রহিত হইয়া উঠিল; যুবতী প্রাণপণে চলিয়াও সঙ্গিনীগণের পশ্চাতে পড়িয়া গেল। আর এক পাক ঘুরিলেই পর্ব্বতের পাদমূলে যাওয়া যায়, এমন সময়ে একখানি প্রস্তরাঘাতে যুবতীর পদাঙ্গুষ্ঠ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া তাহা হইতে প্রবলবেগে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল; তাহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, চক্ষুঃ দৃষ্টিহীন হইল, আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া যুবতী সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। অগ্রগামিনী সঙ্গিনীগণ পর্য্যটন-ক্লান্তি-জনিত অন্যমনস্কতা হেতু কেহই তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

তখন সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ। তাঁহার রক্তিমাভা পর্ব্বতশিরে পতিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, রক্তোষ্ণীষধারী বিরাটপুরুষগণ যোগমগ্ন রহিয়াছেন। সায়াহ্ন-সমীরণ অদূরবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রের স্নিগ্ধতা বহন করিয়া আনিতেছে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও প্রকৃতির এই মনোজ্ঞ ভাবে যুবতীর কতক ক্লান্তি দূর হইল। এমন সময়ে সহসা দিঙ্মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কানন হইতে সুমধুর গীতধ্বনি উঠিল।

"কেন পাসরিতে নারি তা'রে—
যাহার ভাবনা-ফণী দংশে হৃদয়-মাঝারে!
ইহ জীবন পতন, ভেঙ্গেছে সুখ-স্বপন,
হৃদয় দুঃখ-বেদন, প্রকাশি বলি কাহারে?

সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত সেই সঙ্গীত-ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উভয় তটস্থ শৈলমালার শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ উৎফুল্ল হৃদয়ে পক্ষ বিস্তৃত করিয়া গগনমার্গে উড়িতে উড়িতে সেই স্বর-লহরীর সঙ্গে ঝঙ্কার দিতে লাগিল। যুবতী বংশী-রবে-মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া অনন্যমনে সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতে লাগিল। তাহার শিরায় শিরায় অকস্মাৎ যেন তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইল। বহুকালের সুপ্ত স্মৃতি যেন আজি সহসা তাহার হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিল। যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যে দিক্ হইতে সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছিল, উদ্ভ্রান্তচিত্তে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল,—সঙ্গিনীগণ যে তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে, সে চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইল না। গায়ক গাহিতে লাগিল—

ছিন্ন-তার বীণা-সম, ভেঙ্গেছে অন্তর মম,
সে সঙ্গীত কি কারণ, আজো রে মৃদু ঝঙ্কারে?
মনে করি তারে ভুলি, স্মৃতিরে সমূলে তুলি,
তবুরে মন কেবলি, ভাবে তারে বারে বারে!

যুবতী আর স্থির থাকিতে পারিল না, কি জানি কেমন ভাব তাহার হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে বনভূমি বিলোড়িত করিয়া স্বরোদ্দেশে ছুটিল। ক্রমশঃ সেই স্বর যত নিকটবর্ত্তী বোধ হইতে লাগিল, যুবতীর পদক্ষেপ ততই দ্রুত হইল, কিন্তু শেষে প্রকাণ্ড ঐরাবত সদৃশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক শিলাখণ্ড তাহার গতি রোধ করিল। যুবতী থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রস্তরের ঠিক অপর প্রান্ত হইতে সেই সংগীতধ্বনি উঠি-

তেছে। জালবদ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় যুবতী ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া চকিত-নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। দক্ষিণদিকে প্রভূত বেগ-শালী ব্রহ্মপুত্র আপন মনে ছুটিতেছে। একটী অতি সঙ্কীর্ণ পথ সেই প্রস্তরখণ্ড বেষ্টন করিয়া তদভিমুখে গিয়াছে। দেখিবামাত্র যুবতী সেই পথে ছুটিল; কয়েক পদ যাইতে না যাইতে দেখিল, অদূরে এক নবীন সন্ন্যাসী একখানি প্রশস্ত শিলাসনে উপবেশন করিয়া স্তিমিতভাবে মুদিতনেত্রে আপন মনে গান করিতেছেন। তাঁহার ঠিক সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র কল-কল রবে বহিয়া যাইতেছে। সন্ন্যা-সীকে দেখিবামাত্র যুবতীর হৃদয় উথলিয়া উঠিল, তারস্বরে বলিল—"আমার সর্ব্বস্ব ধন!—তুমি—"

পরক্ষণেই আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। সহসা পদস্খলিতা হইয়া যুবতী সবেগে ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে পতিতা হইল। মুখের সেই অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য নিমেষমধ্যে মহানদের অনন্ত প্রবাহে বিলুপ্ত হইল।

* * * *

যুবতীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ নৌকায় আরোহণ করিয়া যখন ব্রহ্মপুত্র-বক্ষে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের দৃষ্টি পড়িল যুবতী তাঁহাদিগের সঙ্গে নৌকায় নাই। তাঁহার কথামত ক্রমে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইল, সকলেই দেখিল যুবতী তাঁহাদের সঙ্গে আসে নাই। তখন নৌকা ফিরাইয়া তাঁহারা পুনরায় শৈলপথের অনুসরণ করিয়া চলিলেন, উচ্চৈঃস্বরে যুবতীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। তখন তিমিরবসনা সন্ধ্যা সমাগতা হইয়াছে, সঙ্কীর্ণ শৈলপথের

উভয় পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য, তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না; অগত্যা যুবতীর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পান্থ-নিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

## নবীন-সন্ন্যাসী।

চিত্রগিরির * দক্ষিণাংশে নিবিড় অরণ্যমধ্যে কতকগুলি সুরম্য গুহা আছে। গুহা গুলির সম্মুখেই অবিচলিত তরঙ্গে প্রবহমাণ নদ-রাজ ব্রহ্মপুত্র। পার্শ্বে বিজন বনস্থলী। প্রকৃতি নিয়তই গাম্ভীর্য্যশালিনী। শান্তিরসাস্পদ তাপসাশ্রমের ইহাই সুযোগ্য স্থান। স্বভাব-সৌন্দর্য্যের রম্য নিকেতন এই সকল গুহাভ্যন্তরে কত সংসারবিরাগী সাধুপুরুষ পূর্ব্বকালে সচ্চিদানন্দের সাধনায় দেহপাত করিয়াছেন, অবিরাম সাম-গানে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত বনজ বিহঙ্গগণ শ্রুতিবিমোহন কাকলিতে যেন তাহারই আবৃত্তি করে।

* 'অশ্বক্রান্ত' শৈলের অপর নাম 'চিত্রগিরি।'

অধুনা এইরূপ এক গুহায় এক নবীন সন্ন্যাসী অবস্থান করেন। সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম আনুমানিক ত্রিংশ বৎসর, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতায় দেহ বিশুষ্ক হওয়ায় যেন স্থবিরের ভাব লক্ষিত হয়। মুখমণ্ডল বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন,—দেখিলেই বোধ হয়, কি এক বিষম মর্ম্ম-পীড়ায় নিপীড়িত হইয়া তিনি ঐহিক সুখে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী প্রতি পৌর্ণমাসী রজনীতে একবার মাত্র নিকটস্থ গ্রামে গমন করিয়া থাকেন। অপর সময়ে কেহ তাঁহার দর্শন পায় না। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। চন্দ্রকরবিধৌত শুভ্র যামিনীতে তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষা করে, সন্ন্যাসী যথাকালে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রালাপনে ও জাতীয় শক্তির উদ্বোধনে এক ক্ষেত্রে তাহাদিগের হৃদয়ে শান্ত ও বীর-রসের অবতারণা করেন। অবশেষে সকলে আপন আপন সংগৃহীত আহার্য্য সন্ন্যাসীকে উপহার দিয়া কৃতার্থ বোধ করে। ইহাতেই সন্ন্যাসীর একমাস কাল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়।

আজি সন্ধ্যা-সমাগমে সন্ন্যাসী শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বভাব-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার হৃদয়ে কি এক পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হওয়ায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে অন্তরের অন্তস্তল হইতে মর্ম্মগীতি ঝঙ্কারিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী আত্মবিস্মৃত হইয়া সুমধুর তানে গান করিতে লাগিলেন। সহসা সম্মুখস্থ সলিলমধ্যে ভীষণ পতন-শব্দে চমক ভাঙ্গিল,—তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে জলরাশি আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই উচ্ছ্বসিত জলমধ্যে

একখানি বস্ত্রের কিয়দংশমাত্র বেগভরে প্রবেশ করিতেছে। দেখিবা-মাত্র সন্ন্যাসী বিদ্যুদ্বেগে ঝম্পপ্রদান করিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইলেন।

বস্ত্রাঞ্চলভাগ লক্ষ্য করিয়া অগাধজলে নিমগ্ন হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই শৈবালসদৃশ কোন কোমল পদার্থ সন্ন্যাসীর হস্ত স্পর্শ করিল। তিনি দৃঢ়রূপে তাহা ধারণ করিয়া সবেগে ভাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জলদেবীর ন্যায় একখানি মোহিনী-মূর্ত্তি জল হইতে উত্থিত হইল! তখন সন্ন্যাসী সেই রমণীর কেশদাম পরিত্যাগ করিয়া এক হস্তে তাহার কক্ষ ধারণ করিয়া অপর হস্তে যথাসাধ্য জল কাটা-ইয়া তটাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। তাহার অমানুষ বলের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোত পরাজয় মানিল। তীরে উঠিয়া এক সুপ্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপর তিনি রমণীকে শয়ন করাইয়া নিতান্ত উৎসুক ভাবে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; লক্ষণ দর্শনে সন্ন্যাসী হতাশ হইয়া পড়িলেন,—বোধ হইল, অভাগিনীর জীবনস্রোত ব্রহ্মপুত্রের অনন্ত স্রোতে মিশাইয়া গিয়াছে! তিনি তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া সেই অচেতন দেহখানি স্কন্ধে লইয়া আপন আশ্রমাভিমুখে ছুটিলেন, যেন সতীদেহ স্কন্ধে উন্মত্ত মহেশ প্রমত্তভাবে ছুটিতেছেন।

# ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

## সম্মিলনে।

মুহূর্ত্তমধ্যে সন্ন্যাসী আপন আশ্রমে উপনীত হইয়া রমণীকে নিজ পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া, অতি সত্বর অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। পরে কৌশলে রমণীর উদরস্থ জল নির্গত করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে অল্প অল্প অগ্নির উত্তাপ দিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি শুশ্রূষার পর ঊষা সমাগমে সন্ন্যাসীর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, দেখিলেন, রমণীর অতি ক্ষীণভাবে নিশ্বাস বহিতেছে। সন্ন্যাসী তখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার আহার নিদ্রা রহিত হইয়া গেল. নিত্য ক্রিয়া বন্ধ হইল, অবিশ্রান্ত ভাবে রমণীর সেবাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ অল্পে অল্পে রমণীর মুখে দেন; আর সতৃষ্ণ নয়নে সেই মুখের প্রতি চাহিয়া থাকেন।

এইরূপ অকপট ও ঐকান্তিক যত্নে চতুর্থ দিবসে, প্রভাত-সমীর স্পর্শে স্ফুটনোন্মুখ পদ্মিনীর ন্যায়,—স্বামি-সম্মিলনে অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াশীলা নব-বধূর ন্যায়,—যুবতীর নয়ন পল্লব দুটি ধীরে ধীরে কম্পিত হইতে দেখা গেল; যেন অল্পক্ষণ পরেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবে। সন্ন্যাসী সতৃষ্ণনয়নে সেই নৈসর্গিক পদার্থদ্বয়ের পরিস্ফুটনের প্রথম শোভারাশি দেখিবার জন্য চাহিয়া আছেন। সহসা রমণীর বাম হস্ত খানি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া বক্ষোপরি স্থাপিত হইল, দেখিয়া সন্ন্যাসী পরমানন্দিত হইলেন; এবং যাঁহার প্রসাদে এই অনাথা রমণীর জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, নয়ন মুদিয়া সেই অনন্ত মহাপুরুষকে হৃদয় ভরিয়া একবার ধ্যান করিয়া লইলেন।

যুবতী ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আশ্রমের চারিদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপর পতিত হইল; অমনি অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে একবার কি বলিয়া আবার চক্ষু নিমীলিত করিল। শরীর পুনর্ব্বার নিস্পন্দ! রমণী যেন আপনার হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ছিন্ন ভিন্ন স্মৃতি রাশি একত্র করিতেছে। সন্ন্যাসী অনিমেষ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর মধ্যে সাহসা একটি তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইল। সেই সংজ্ঞাহীনা রমণীর মুখচ্ছবি দৃষ্টে তাঁহার অন্তরে এক নিভৃত কক্ষ উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং তন্মধ্য হইতে একখানি বিষাদময়ী দেবী-মূর্ত্তি হাসিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বাম হস্তে স্বীয় ললাট দেশ চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। যেন ঐ সম্মুখশায়িতা যুবতীর সহিত তাঁহার হৃদয়াঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি খানির তুলনা

করিতে লাগিলেন! সেই মুখ—সেই চক্ষু—সেই দেহলতা,—সবই সেই! সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন,—চক্ষু মেলিলেন—সম্মুখে সেই সুবর্ণ প্রতিমা! তথাপি আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, সকলই যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল! তিনি পুনর্ব্বার নয়ন মুদিলেন, আবার চাহিলেন—সেই মূর্ত্তি! এবার যেন আরও উজ্জ্বল, আরও স্পষ্ট! সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, "হেম—আমার হেম--আমার হৃদয়প্রতিমা—তুমি?" বলিয়া বিহ্বলের ন্যায় সেই রমণী-মূর্ত্তিকে বক্ষে করিয়া লইলেন।

সহসা যেন যুবতীর অন্তরস্থ নিবিড় কুজ্ঝটিকা-জাল তিরোহিত হইল। স্মৃতির আলোক ফুটিয়া উঠিল। যুবতী চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল—সম্মুখে সেই দিব্য মূর্ত্তি জটাজুটধারী তপস্বী—তাহাকে হৃদয় মধ্যে লইয়া অনিমেষ নয়নে তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া আছেন! রমণী বিভ্রান্ত নয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল—নয়নে নয়নে মিলিল,—রমণী চীৎকার করিয়া আবার সংজ্ঞাহীনা!

চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রমণী উন্মত্তার ন্যায় উঠিয়া বসিয়া সন্ন্যাসীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কত শত ভাব তরঙ্গে—কত শত স্মৃতির প্রবাহে তাহার হৃদয় আকুলিত করিল। নীরবে অনর্গল অশ্রুধারায় সন্ন্যাসীর দেহ অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে হৃদয়-বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে হেমলতা প্রবোধ চন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কেন,—কেন আমার সর্ব্বস্বধন তোমার এই বেশ? এই রাক্ষসীর জন্যই কি তুমি বনবাসী—সন্ন্যাসী?—এই পাপিনীই কি তোমার সকল দুঃখের মূল?"—

অভাগিনী আর বলিতে পারিল না, কেবল অধীর-ভাবে কাঁদিতে লাগিল!

প্রবোধচন্দ্র তখন আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "হেম! পূর্ব্ব স্মৃতি বিস্মৃত হও!"

হেমলতা দৃপ্ত সিংহীর ন্যায় সতেজে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিল, "বিস্মৃত হইব?—যাহা হৃদয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে,—যাহার দেব-তুল্য প্রতিমূর্ত্তি খানি বুকের মাঝে সর্ব্বদা জাগরূক,—মন যাহাকে ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বদা পূজা করে—কি করিয়া তাহাকে ভুলিব দেব? এ হৃদয় চূর্ণ না হইলে—এ দেহ জ্বলন্ত অনলে ভস্মীভূত না হইলে তাহা কিছুতেই যাইবার নয়! ভাবিয়াছিলাম এ জন্মে বুঝি আর কখনও তোমার দর্শন পাইব না;—বিধাতা বুঝি এ জন্মের সাধ আমায় মিটাইতে দিবেন না;—হৃদয়ের ক্ষোভ—মরমের বেদনা—মর্ম্মে মর্ম্মে থাকিয়া যাইবে—কিন্তু আজ আমার সে কষ্ট-যন্ত্রণা দূর হইল! চল ভাই, চল! এ হতভাগিনীর জন্য অনেক ক্লেশ পাইয়াছ—অনেক দুঃখ সহিয়াছ—এখন এ পাপিনী তোমার সেবা করিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে! তোমার এই কষ্ট!—সর্ব্বত্যাগী বনবাসী তপস্বী!—বল দেব! বল, বল, এ অভাগিনীর এই শেষ সাধটি কি পূর্ণ করিবে না?"

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

## অতীত কথা।

প্রবোধচন্দ্রের গৃহত্যাগ অবধি পাঠকবর্গ কন্দর্পপুরের কোন সংবাদ রাখেন নাই, প্রবোধচন্দ্রই বা কি সূত্রে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, তাহাও জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে সংক্ষেপে সেই সমস্ত কথা বলিতেছি।

যে সংক্রামক রোগে কন্দর্পপুর শ্রীভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গ্রাম উৎসন্ন করিয়া তুলিল। পতিহীনা স্ত্রীর, পুত্রহারা জননীর, পিতৃমাতৃহীন শিশুর কাতর-ক্রন্দনে আর শৃগাল-কুক্কুরের অশিব নিনাদে গ্রাম প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত আর সকল স্থান শ্মশানে পরিণত হইল। দেশের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথ সপরিবারে কলিকাতাবাসী হইলেন। এইরূপ যাহার অন্যত্র আত্মীয় কুটুম্ব বা আশ্রয়-স্থান ছিল, সেই দেশের বাস উঠাইল

এই অবস্থায় গ্রামের পাঠশালাটী উঠিয়া গেল,—ঈশ্বরচন্দ্রের পণ্ডিতির পরিসমাপ্তি হইল। ঐ দেশব্যাপী রোগে আক্রান্তা হইয়া তাহার জননীও এই সময়ে ইহলীলা সংবরণ করিলেন,—অভাগিনীর যন্ত্রণার অবসান হইল। ঈশ্বরচন্দ্রের সুতরাং উভয় কারণেই দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা বন্ধ হইল। শ্যামাচরণের সহিত আর তাহার সেকালের সদ্ভাব নাই, শ্যামাচরণের এখন সে অবস্থাও নাই,—সুতরাং সে দিক্ও শূন্য; ঈশ্বর ক্রমাগত চারি দিবস একরূপ অনাহারে কাটাইয়া, অসহ্য যন্ত্রণায় এত দিনের পর একবার মা'র জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া উন্মত্তের ন্যায় বাটী হইতে বহির্গত হইল। কিছু দিন পরে তাহাকে এক চটের কলে কাজ করিতে দেখা গেল।

ইতিপূর্ব্বে শিবপ্রসাদ দিগম্বরী সহ কাশীবাস করেন, সেখানে অল্প দিনের মধ্যে উভয়েরই ৺কাশী প্রাপ্তি ঘটে।

শ্যামাচরণের প্রবাদ-মূলক জমিদারী ইতিপূর্ব্বেই প্রবাদ-মূলক 'লাটে' উঠিয়াছিল! অনাথা বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া সে যে অর্থ-রাশি সংগ্রহ করিয়াছিল, সুরা এবং তদানুষঙ্গিক নানাবিধ দুষ্ক্রিয়ার স্রোতে পড়িয়া তাহা অচিরেই কোথায় ভাসিয়া গেল। শ্যামাচরণের আবার যে অন্নকষ্ট সেই অন্নকষ্ট! তাহার মাতা এবং ভগ্নীদ্বয়ের তখন চৈতন্য হইল, আবার সেই চাকুরে লালমোহনের অন্নই মিষ্ট ভাবিয়া তাঁহাদিগকে শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতে হইল। লালমোহন পূর্ব্ববৎ যত্নসহকারে যথাসাধ্য তাঁহাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন,—অতীত ঘটনার কিছুই উল্লেখ করিলেন না।

শ্যামাচরণ কন্দর্পপুরেই রহিল, কলিকাতায় গিয়া লালমোহনের আশ্রয়ে থাকিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে আবার নূতন জমি-

দারী প্রাপ্তির জন্য চক্রান্ত করিতে লাগিল এবং অচিরেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইল। গ্রামের একটী বিষয়ী লোকের মৃত্যু হইল; তাঁহার বিধবা পত্নী ও কয়েকটী অপোগণ্ড শিশু ভিন্ন বিষয়াদি রক্ষণের কোন অভিভাবক ছিল না। সেই বিষয়ের উপর শ্যামাচরণের নিতান্ত লোভ জন্মিল। সে অচিরাৎ একখানি জাল দলিল প্রস্তুত করিল। তাহাতে প্রকাশ—মৃত ব্যক্তি দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার নিকট বিষয়াদি বন্ধক রাখিয়া পাঁচশত টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল, ইহার সাক্ষী গ্রামস্থ কয়েক ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, ঐ কয়েক জন শ্যামাচরণের যাবতীয় দুষ্কার্য্যের সহযোগী।

এই দলিলের সাহায্যে শ্যামাচরণ মৃত ব্যক্তির বিষয়াদি দখল করিয়া বসিল; কিন্তু হায়! এবার তাহা অধিক দিন তাহার ভোগে লাগিল না। ওকালতী বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথের তখন বিলক্ষণ প্রতিপত্তি জন্মিয়া ছিল, চরিত্র-মাধুর্য্যেও তাঁহার সর্ব্বত্র যথেষ্ট প্রশংসা ছিল। অনাথা বিধবা শিশু কয়েকটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যোগেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিধবার মৃত পতির অবস্থা ও শ্যামাচরণের প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি প্রকৃত ব্যাপার স্থির করিয়া বিধবা ও তাঁহার সন্তান গুলিকে আপন বাসায় যত্নপূর্ব্বক রাখিলেন এবং পত্রদ্বারা লালমোহনকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন। উত্তরে জানিতে পারিলেন, যথেষ্ট চেষ্টা ও অনুরোধ সত্ত্বেও লালমোহন শ্যামাচরণকে সৎপথে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারেন নাই, এরূপ অবস্থায় শ্যামাচরণ স্বকৃত দুষ্কার্য্যের যথাবিহিত শাস্তি পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

যোগেন্দ্রনাথ তখন দলিল সম্বন্ধে সবিশেষ তদন্ত করিয়া বিধবার দ্বারা শ্যামাচরণের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করাইলেন এবং স্বয়ং অসাধারণ অধ্যবসায়-সহকারে মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া অচিরেই ঐ দলিলের কৃত্রিমতা সুপ্রতিপন্ন করিলেন। বিচারে—দেওয়ানিতে বিধবার বিষয়-লাভ এবং ফৌজদারীতে জাল করা অপরাধে শ্যামাচরণের চতুর্দ্দশ বৎসর "অজ্ঞাতবাসে"র—আজ্ঞা হইল। শ্যামাচরণের মাতা বলিতেন, তাহার কপালে 'রাজদণ্ড' আছে. এত দিনে তাহা সার্থক হইল!

* * * *

এদিকে প্রবোধচন্দ্রের গৃহত্যাগের পর পদ্মাবক্ষে ঝটিকা-বৃষ্টি-যোগে নৌকা মগ্ন হওয়া সূত্রে ঢাকার সংবাদ পত্র পাঠে যোগেন্দ্রনাথ যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহাই অনেকাংশে ঠিক বটে। প্রবোধচন্দ্রই সেই নৌকায় একমাত্র আরোহী ছিলেন এবং নৌকা ও নাবিকের সহিত জলনিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, তাহাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই।

রতনগঞ্জের সুবিখ্যাত জমিদার-বংশ দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদগুণে মণ্ডিত। পদ্মাতীরে তাঁহাদিগের বাস। অন্যবিধ সহস্র সৎকার্য্যের সঙ্গে ঝড়-তুফানের সময়ে পদ্মাবক্ষ হইতে বিপদাপন্ন নৌকা সমূহকে ও আরোহিবর্গকে যথাসম্ভব রক্ষা করা তাঁহাদিগের অন্যতম কার্য্য। এই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিয়োজিত অনেক সুদক্ষ ও বিশ্বাসভাজন মাঝি ছিল। প্রবোধচন্দ্র যখন তরঙ্গ সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে অবশেষে অবশ হইয়া জলমগ্ন হয়েন, তখন এইরূপ একটু ব্যক্তির বিশেষ চেষ্টায় তিনি তীরে নীত হয়েন এবং বর্ত্তমান

জমিদার ও তাঁহার একমাত্র যুবা পুত্র ভবদেবের অকৃত্রিম যত্ন ও শুশ্রূষায় অচিরে সংজ্ঞা ও জীবন লাভ করেন।

ঐ স্থানে অবস্থান কালে সমবয়স্কতা ও প্রকৃতিগত একতা প্রযুক্ত ভবদেব ও প্রবোধচন্দ্রের মধ্যে সখ্য সংস্থাপিত হয়। প্রবোধচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, ভবদেবের দেবদুর্লভ চরিত্রগুণে তিনি পুনরায় সংসারে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কিন্তু তাহা নহে,—তিনি, প্রকাশ্যে অসম্ভব বুঝিয়া, গোপনে সেস্থান হইতে পলায়নের পন্থা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এজন্য তাঁহাকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না; শীঘ্রই সুযোগ উপস্থিত হইল। জমিদার বাবুদিগের বাটীতে প্রত্যহ অতিথি-সেবা হইত। এক দিবস কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে এক সন্ন্যাসী তথায় আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে প্রবোধচন্দ্রের মনে স্বতঃই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হইল, আলাপেও তিনি বুঝিতে পারিলেন—সন্ন্যাসী প্রকৃতই পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষ। তিনি বিনীত-ভাবে সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং পর দিবস প্রত্যূষেই ভব-দেবের অজ্ঞাতসারে সেই সুখ-ভবন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর পদা-নুসরণ করিলেন। গমন কালে তাঁহার জীবনদাতা প্রিয় সুহৃদ ভব-দেবকে আমূল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা-সূচক পত্র লিখিয়া গেলেন এবং তাঁহার উদ্দিষ্ট পথ হইতে যেন তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত না করেন, পত্র মধ্যে তৎপক্ষে একান্ত অনুরোধ করিলেন।

এইরূপে সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া প্রবোধচন্দ্র তৎসঙ্গে 'চন্দ্র-নাথ,' 'জয়ন্তীশ্বরী,' 'বশিষ্ঠাশ্রম,' প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরি-

শেষে 'নীলাচলে' আরোহণ পূর্ব্বক কামাখ্যাদেবী সন্দর্শন করিলেন। অনভ্যস্ত দীর্ঘ পর্য্যটনে ও অনিদ্রা অনাহার প্রভৃতি কায়িক ক্লেশে প্রবোধচন্দ্র এই স্থানে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এদিকে বর্ষা আগত প্রায়, সেই সময়ে যাত্রা না করিলে সন্ন্যাসীর অভীপ্সিত "পরশু-রাম-কুণ্ড" দর্শন ঘটে না। এজন্য 'ভুবনেশ্বরী' মন্দিরবাসী জনৈক পরমহংসের হস্তে প্রবোধচন্দ্রের শুশ্রূষার ভার ন্যস্ত করিয়া অপর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসী 'পরশুরাম' তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পরমহংস পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রবোধচন্দ্রকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুশ্রূষাগুণে প্রবোধচন্দ্র অচিরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। প্রবোধ-চন্দ্র বাল্যে শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নিকটে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া-ছিলেন—ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার একরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল; পথে সন্ন্যাসীর নিকট তিনি দর্শন-পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, অধুনা পরমহংস দেবের নিকটে তাহারই সম্যক্ অনুশীলন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানে পরমহংসদেব পর্য্যাটক সন্ন্যাসী ঠাকুর অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না; তাঁহার অধ্যাপনাগুণে ও স্বীয় প্রতিভাবলে প্রবোধ-চন্দ্র অল্পকালের মধ্যেই ঐ সকল বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিলেন। এখানে অধিক দিন থাকার পক্ষে কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের এক বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল;—সংসারের যে তীব্র হলাহলের ভয়ে তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিলেন—নীলাচলেও তাহা বিরল নহে। পরিব্রাজক-ধর্ম্মে অপটু বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরও তাঁহাকে আর দর্শন দিলেন না। এজন্য তিনি পরমহংসের

নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া "চিত্রগিরির" পাদমূলস্থ এক সুপবিত্র শান্তিময় গুহায় আশ্রয় লইয়া ভগবচ্চিন্তায় কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই অবস্থাতেই পাঠক ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

# অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

## আয়োজন।

প্রবোধচন্দ্র দেশে আসিয়া হেমলতার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। প্রথম প্রথম হেমলতার জ্ঞাতিবর্গ ইহাতে বিশেষ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল চরিত্রের সহিত যত পরিচিত হইতে লাগিল, ততই তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল। যোগেন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বীরনগরে আগমন করিলেন। তখন দুই বন্ধুতে কত সদালাপ হইল। দুই একদিন পরে যোগেন্দ্রনাথ প্রবোধকে সঙ্গে লইয়া নিজ বাটীতে গেলেন। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বেশীদিন সেখানে থাকিতে পারিলেন না—বীরনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রবোধচন্দ্র সংসার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সংসার তাহাকে সংসারী করিতে পারিল না। তাঁহার সেই জটা-

জুট ও গৈরিকবাস প্রভৃতি শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত নিয়মাবলী যথারীতি পালন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দীর্ঘকাল সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে হেমলতার অসামান্য যত্নে তাহার সেই স্বাস্থ্য পুনরুজ্জীবিত, এবং শরীর নব উৎসাহে গঠিত হইতে লাগিল। তিনি হেমলতার নিকট মাতার ন্যায় হৃদয় ঢালা স্নেহ,—ভগিনীর ন্যায় আন্তরিক ভালবাসা,—প্রতিবেশিনীর ন্যায় সৌহৃদ্য,—সহধর্ম্মিণীর ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, এবং সর্ব্বোপরি উপাসকের ন্যায় দেবোচিত সেবা পাইতে লাগিলেন! হেমলতা—তাঁহার শৈশবের সহচরী—যৌবনের উপাস্যদেবী—অতীতের স্মৃতি—সংসার-মরুর একমাত্র অমৃতময় নির্ঝরিণী—সেই আনন্দময়ী জীবনস্বরূপিণী হেমলতা, আজি তাঁহাকে দেবভাবে পূজা করিতেছে! প্রবোধচন্দ্র ভাবিলেন এ জীবনে ইহা অপেক্ষা আর সুখ কি? এ সংসারে ইহার তুল্য আর সৌভাগ্য কাহার? এ পৃথিবীতে তাঁহার কে নাই? সকলেই আছে! তাঁহার মাতা আছে, ভগিনী আছে, ভ্রাতা আছে, আত্মীয় আছে—এক হেমলতাতে তাঁহার সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে—তিনি অসুখী কিসে? কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাঁহার এই স্বপ্নটীও ভাঙ্গিয়া দিল।

প্রবোধচন্দ্র হেমলতার অসামান্য শুশ্রূষা ও যত্নে তাঁহার সেই সন্ন্যাসজনিত নষ্টপ্রায় স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিতে ছিলেন, কিন্তু সহসা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। হেমলতার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল। আহার নিদ্রা পরিহার করিয়া দিবারাত্র রুগ্ন-শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মুখে ঘোর বিষাদের কালিমা-ছায়া অঙ্কিত হইল। রোগী

অজ্ঞান অচৈতন্য। হেমলতা—তাঁহার হৃদয়ের হেমলতা যে আজ দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, তাহা দেখিতেছেন না। হেমলতা আজ তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রাণ ভরিয়া হৃদয়-সাধ মিটাইতেছে, জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতেছে, প্রবোধচন্দ্র তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। তিনি অজ্ঞান—অচৈতন্য!

সহসা ধীরে ধীরে তাঁহার নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। হেমলতা দেখিল, চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ, বুঝিল পূর্ণ বিকার!

প্রবোধচন্দ্র নয়নোন্মীলন করিয়া, হেমলতার প্রতি চাহিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন। তাঁহার সে শূন্যময় হাস্যে হেমলতার হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া গেল। প্রবোধচন্দ্র ধীরে ধীরে একখানি হাত ধরিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হেম,—দেবী, আমি চলিলাম। এ জীবনে সকল সাধ আমার পূর্ণ হইয়াছে। আমি এ সংসারে সুখী,—পরম সুখী! বিধাতা যে এ ভগ্ন হৃদয়ে, এ দগ্ধ অদৃষ্টে, শেষে এত সৌভাগ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন চলিলাম। সুখে—পরম সুখে, এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। হৃদয়ের সেই অনন্ত-গভীর অন্ধকার রাশি এখন অপসৃত হইয়া গিয়াছে; তোমার ঐ পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতিতে এখন তাহা উদ্ভাসিত! ঐ জ্যোতিতে আত্মাকে অবগাহন করাইয়া, হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঐ জ্যোতিরাশি অনুলিপ্ত করিয়া লইয়া চলিলাম। দেখ দেবী—দেখ, আবার যেন পরজগতে এ হৃদয় উৎপাটিত ও মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন না হয়! দেখ, আবার যেন কেহ অসুর বলে তোমার ঐ পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি খানি হৃদয় মন্দির হইতে কাড়িয়া না লয়!"

প্রবোধচন্দ্র নীরব হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া তপ্ত অশ্রু-ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

হেমলতা এতক্ষণ বিকলহৃদয়ে প্রবোধ চন্দ্রের হৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত বাক্যাবলী শুনিতে ছিল। সহসা তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সেই বহুকালের সুখস্মৃতি একে একে তাহার মনো-মধ্যে উদয় হইতে লাগিল। সেই শারদীয় সুনির্ম্মল-চন্দ্রকর-ধৌত সুখ-রজনীতে, প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবীর তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরস্পরের সেই প্রণয়-উৎসের প্রথম প্রপাত,—হৃদয়ের আশা-সুখ-কাননের প্রথম পুষ্পোদ্গম, একে একে সকলই মনে পড়িল। উন্মাদিনীর ন্যায় প্রবোধচন্দ্রের বক্ষোপরি পতিত হইয়া, কাতর কণ্ঠে বলিল, "ভাই! আর না। এ হৃদয়ে অনেক সহিয়াছি, আর পারি না! এ ক্ষতবিক্ষত দগ্ধহৃদয়ের জ্বালায় এতদিন মরমে মরমে জ্বলিয়া মরিয়াছি, তাহার উপর বিধাতার এক একটী বজ্রাঘাতের অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়াছি, হৃদয়ের সেই গভীর বেদনা, অনন্ত যাতনা-রাশি, একদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহাকেও জানিতে দেই নাই; আপনিই জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, আপনিই সহিয়াছি, মরিয়াছি,—কিন্তু আজ আর পারিতেছিনা। হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে! তুমি যাইবে? এ হতভাগিনী পাপিনীকে সংসারের জ্বলন্ত গরলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া তুমিও যাইবে?—যাও দেব, বারণ করি না! তুমি দেবতা, এ পাপিনীর জন্য কেন এ পাপ সংসারে থাকিয়া ক্লেশ পাইবে? এ মহাপাতকিনী এ সংসারে কেবল জ্বলিতেই আসিয়াছে, চিরকাল জ্বলিবে! কিন্তু আজ একবার হৃদয় খুলিয়া প্রাণভরিয়া তাহার সেই হৃদয় দেবতার সেবা করিয়া, তাঁহাকে "দেবতা বলিয়া

ডাকিয়া, তাহার সেই জ্বালার উপশম করিবে—অন্তরের সেই অনন্ত বাসনার তৃপ্তি সাধন করিবে!”

অভাগিনী আর বলিতে পারিল না। সহসা কণ্ঠরুদ্ধ হইল—শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল! হেমলতা ছিন্ন-মূলা লতার ন্যায় সেই শয্যাপার্শ্বে মূর্চ্ছিতা হইল!

## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### সজ্জা।

যখন জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন হেমলতা দেখিল, সে আপন শয়নকক্ষে শায়িত রহিয়াছে। তাহার একপার্শ্বে একটি যুবা পুরুষ ও অপর পার্শ্বে তাহার বাল্যসহচরী সরোজ বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। সরোজের চক্ষু দুইটি প্রাবৃটের সদ্যঃপ্রস্ফুট শতদলের ন্যায় জলভরে টল্ টল্ করিতেছে। হেমলতা শূন্যনয়নে একবার উহাদিগের প্রতি এবং পরে গৃহের চতুর্দ্দিক চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল।

প্রায় সপ্তাহাধিক কাল পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া হেমলতা তাহার বাল্যসখা—জীবনের ধ্রুবতারা প্রবোধচন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। এই কয়দিনের মধ্যে সে আপন শরীর-আপন অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত করে নাই। ক্রমে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; সে জোর করিয়া শরীরের সেই

অবসাদ ভাবকে ফুটিতে দেয় নাই। সহসা তাহার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন বিকার প্রবল হইয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল—দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইল। শরীরমধ্যে যেন কি একপ্রকার ভয়ঙ্কর যাতনা অনুভূত হইল। শেষে মূর্চ্ছিত হইয়া সেই মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে পতিত হইল। আজ তিন দিনের পর তাহার সে মূর্চ্ছার অপনোদন হইয়াছে। এই তিনদিনের মধ্যে চিকিৎসক অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই জ্ঞান সঞ্চার করাইতে পারেন নাই। দেখিয়া শুনিয়া তিনি হতাশ হইয়াছেন; বলিয়াছেন মৃত্যু নিশ্চয়।

হেমলতার জ্ঞান সঞ্চার হইতে দেখিয়া সরোজের শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সে রোদন করিতে করিতে হেমলতার মুখের নিকট মুখ দিয়া ডাকিতে লাগিল। হেমলতা আবার চক্ষু মেলিল। তাহার সেই শূন্যময় দৃষ্টি দেখিয়া সরোজের ভয় হইল, বলিল, "অমন করিয়া কি দেখিতেছ?"

হেমলতা যেন তাহা শুনিতে পাইল না। আপন মনে কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া, পরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'বুঝিয়াছি এ হতভাগিনীকে তুমিও ফাঁকি দিয়া যাইবে—এ পাপিনীকে তুমিও পরিত্যাগ করিবে—তুমি ইহাকে এই জ্বলন্ত আগুনে ফেলিয়া যাইবে? না, না, তা ভাবিও না। আমি আর তোমায় ছাড়িব না। ভাবিয়াছ তুমি আমার আগে যাইবে? না;—তাও পারিবে না। আমিই চলিলাম। তুমি দেবতা, স্বর্গে অনেক দেবকন্যা আছে, তোমায় ভুলাইয়া লইবে। আমি আগে যাইয়া তোমার জন্য বসিয়া থাকিব! তুমি দেবতা? হাঁ;—আমারই দেবতা! আমি জন্মাবধি কেবল

তোমারই আরাধনা করিয়া আসিতেছিলাম! যেওনা, দেব! যেওনা, এ দুর্ভাগিনীকে একাকিনী ফেলিয়া তুমি যেওনা! এ বুকে অনেক জ্বালা সহিয়াছি,—আর পারি না! এ হৃদয়ে অনেক যাতনা পাইয়াছি—বিস্তর পুড়িয়াছি,—পুড়িতে পুড়িতে হৃদয় ভস্ম হইয়া গিয়াছে! তুমি দেবতা! ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পার! অধিনীর প্রতি সদয় হও! আমার প্রাণের ব্যথা তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিবে দেব? আমার প্রাণের কান্না তুমি ভিন্ন আর কে নিবারণ করিবার আছে প্রভু?" বলিতে বলিতে হেমলতা অজস্রধারে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সরোজও কাঁদিতে কাঁদিতে, আপন অঞ্চলদ্বারা তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া গদ্গদস্বরে বলিল, "দিদি আমার! অমন করচ্ছ কেন বোন্?"

হেমলতা আবার সরোজের প্রতি চাহিল। অনেক্ষকণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "কে তুমি?" আমার সরোজ?—সরোজ! দিদি আমার! বড় জ্বালা—প্রাণ যায়—সব জ্ব'লে গেল!

সরোজ কাঁদিতে কাঁদিতে একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। হেমলতা আবার চক্ষু বুঁজিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সরোজ তাহার সেই বিকট হাসি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। হেমলতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে গাহিতে লাগিল—

"দে গো সাজাইয়া সাধের বাসর
দেগো সাজাইয়া সই!
উজলি ভুবন, হৃদয় রতন,
দেখলো আসিছে ওই!

আন্‌লো সজনী, কুসুমের ভার
যা'লো বোন্ ত্বরা করি,
জুড়াইল জ্বালা, গাঁথিব লো মালা,
হৃদয় বাসনা ভরি!
দেলো ত্বরা করি, বিনায়ে কবরী
সাজা লো ফুলের ভার,
(আর) মনোমত দুটা কুসুমের দুল
দোলা অলকে আমার।"

গাহিতে গাহিতে হেমলতার মুখ সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই বিবর্ণ বিশুষ্ক অধরোষ্ঠ দু'খানি পর্য্যুসিত গোলাপদলের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

সরোজ আরও ভীতা হইল এবং শোক-রুদ্ধ-কণ্ঠে হেমলতার চিবুক ধরিয়া ডাকিল। হেমলতা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আবার গাহিতে লাগিল—

"এসহে বঁধুয়া, কহ কি লাগিয়া,
আসিতে বিলম্ব হেন?
হিমানী ঋতুর চাঁদিমার পারা,
মু'খানি মলিন কেন?
কি বিষাদে আজ বিষাদিত হেন,
বল বল চিত-হারী!
এখনি তাহায় ভাসাইব দূরে
বরষি প্রেমের বারি!"

গাহিতে গাহিতে তাহার মুখ যেন সহসা বিষন্ন ভাব ধারণ

করিল, চক্ষু দুটি জল ভরে টল টল করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সকরুণ কণ্ঠে আবার গাহিল :—

"তোমার লাগিয়া সয়েছি যে জ্বালা
কি কব হৃদয়চোর!
গুমরি গুমরি বুক ফেটে মরি
(তবু) প্রাণ নাহি যায় মোর!
যাহার লাগিয়া, সদা কাঁদে হিয়া,
ক্ষণতরে তার তরে—
ফুটিয়ে ফুকারি কাঁদিতে না পারি
পাপ-লোক-লাজ ডরে!
এতদিনে বিধি মুখ তুলি ওগো
চাহিল অভাগী পানে,
মিটাইল আশা হৃদয় পিপাসা,
জুড়াল তাপিত প্রাণে!
আর না ছাড়িব তোমারে বঁধুয়া
কভু না ছাড়িব আর,
শরম ভরম ধরম করম
সকলি তুমি আমার!
যতনে তুষিব, হৃদয়ে রাখিব,
বাঁধিব প্রেমের ডোরে
(আর) নিতি নিতি ওই বিধু মুখখানি
হেরিব পরাণ—ভ'রে।"

রুগ্না আবার নয়ন মুদিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সরোজ কাঁদিতে

কাঁদিতে যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিল "কি বুঝিতেছ ?"
যুবা। – ঘোর বিকার—প্রলাপ—আশা নাই।

সরোজ অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বাতাস করিতে লাগিল। এই সময় যুবক একপাত্র ঔষধ ঢালিয়া সরোজের হাতে দিলেন। সরোজ ধীরে ধীরে হেমলতার মুখে ঢালিয়া দিল। দিবামাত্র হেমলতা মুখ বিকৃতি করিয়া, চক্ষু মেলিল। সরোজ ডাকিল। হেমলতার দৃষ্টি সরোজের উপর পতিত হইল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া ঘুরিয়া সেই দৃষ্টি আবার যুবকের উপর পড়িল এবং তৎপ্রতি কিছুক্ষণ স্থির ভাবে চাহিয়া, আবার সেই দৃষ্টি সরোজের উপর পতিত হইল; এবং সঙ্কেতে যুবাকে দেখাইয়া দিল। সরোজ কহিল "চিনিতে পারিতেছ না ?"

হেমলতা আবার কিছুক্ষণ যুবকের প্রতি চাহিয়া ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল, "চিনিয়াছি! তুমিও একটি দেবতা! আমার সরোজের দেবতা! এ পৃথিবীতে সকলেরই এক একটি দেবতা থাকে। আমারও একটি দেবতা ছিল। আমি সেটিকে কত ভক্তি, কত স্তব স্তুতি কত পূজা আরাধনা করিতাম। দেবতাও আমার আরাধনায় তুষ্ট হ'য়েছিলেন, আমার প্রতি সদয় হ'বেন ব'লেছিলেন; কিন্তু পরে আর আমি তাঁকে পেলাম না! কতকগুলা রাক্ষস জুটে আমার সেই প্রাণের দেবতাকে কোথায় লুকিয়ে রাখলে। আর একজন—কে জানে কাহাকে দেবতা সাজিয়ে আমায় এনে দিলে। আমি কত কাঁদলেম্—আমার সেই প্রাণের দেবতাটীর জন্য কত কাঁদলেম্। কিন্তু রাক্ষসগুলা আমার বুক চেপে ধ'রলে—প্রাণ ভ'রে কাঁদতেও দিলনা। পরে সেই দেবরূপীকে—একজন এসে আমায় জোর

করে কোথায় নিয়ে গেল, কত যাতনা দিল, বুকের ভিতর তপ্ত লোহার শলা দিয়ে পুড়িয়ে দিল! এই দেখ আজও সেই ঘা!—দেখ [illegible]লার সঙ্গে মিশে আবার নাকি দেবতারাও রাক্ষস হ'য়ে যায়। তুমি যেন তা হ'ওনা। তা হ'লে আমার সরোজ আমার সোণার সরোজ প্রাণে বড় ব্যথা পাবে! না, না, আমি জানি তুমি তা কখনই হ'বেনা। তুমি একটি যথার্থ দেবতা;—আমার সরোজের দেবতা!—সরোজ, দিদি আমার! প্রাণ যায়—একটু জল" বলিয়া মুখব্যাদান করিল। সরোজ কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে জল লইয়া মুখে দিল। কিন্তু তাহা আর গলাধঃ হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে চক্ষু ঘুরিতে লাগিল,—মুখে যেন কেমন এক প্রকার ছায়া পড়িল। সরোজ জলপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া "ওগো কি হলো" বলিয়া কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িল।

ঠিক এই সময়ে প্রবোধচন্দ্রের ঘর হইতে আর একটি করুণ-কোলাহল-ধ্বনি শ্রুত হইল। সরোজ উন্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দিকে ছুটিয়া গেল।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব-বাসর।

মনুষ্যের সুখ দুঃখ, শোক-তাপের সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির কোনরূপ সংস্রব নাই। মানুষ সৌভাগ্য-সম্পদের সুখাসনে সমাসীন, আনন্দ-তুফানে ভাসমান,—প্রকৃতি ইহা উপেক্ষা করিয়া প্রখরা রণ-রঙ্গিণী বা পূর্ণ বিষাদময়ী,—কড় কড় রবে বজ্র নির্ঘোষ,—ঝম ঝম শব্দে বারি বর্ষণ,—নদীবক্ষে তরোঙ্গচ্ছ্বাস,—চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার! মনুষ্য দুঃখে অবসন্ন,—প্রকৃতি চন্দ্র-সূর্য্য কিরীটিনী, কুসুম-কুন্তলা, হাস্যোৎফুল্ল-বদনা। যদ্যপি মনুষ্যের সুখ দুঃখ অবস্থা বিপর্য্যয়ের সহিত প্রাকৃতিক কোনওরূপ ব্যতিক্রম সংঘটিত হইত, তবে আজি এই অনন্ত দুঃখ পূর্ণ ভারত-সংসারে চন্দ্র-সূর্য্য হাসিত না,—নক্ষত্র ফুটিত না, বায়ু স্থগিত হইত,—নির্ঝরিণী গান ভুলিত,—কুসুম কোরকেই বিশুষ্ক হইত।

* * * *

আজি এই অপরাহ্ণে শ্মশান-সৈকতে যে বিষাদময় দৃশ্যের সমা-বেশ হইয়াছে, তাহা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু প্রকৃতি —শ্রী—সায়াহ্ণ-শোভায় বিকশিত হইয়া জগতের মন ভুলাইতে ব্যাপৃত! সেই স্বর্গীয় শোভার প্রতিবিম্ব আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া জাহ্নবী মন্থর ভাবে প্রবহমানা! বায়ু নিস্তব্ধ,—পৃথিবী নীরব,—সকলই যেন নিস্পন্দ ভাবে বিমোহিত চিত্তে প্রকৃতির শোভা দর্শনে নিয়োজিত।—

শ্মশান ভূমিতে জনতার সীমা নাই। হেমলতার জ্ঞাতিবর্গ সকলই উপস্থিত। সকলেই অবনতমস্তকে গভীর বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছে। সকলেরই মন যেন সংসার ছাড়িয়া কোনও অনির্দ্দিষ্ট প্রদেশে বিচরণ করিতেছে। তখন যোগেন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শোকাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। যথা কর্ত্তব্য সমাধা করা হউক"—বলিয়া, তিনি স্বহস্তে কলসী করিয়া গঙ্গাজল আনয়ন পূর্ব্বক দুইটা মৃতদেহকে অভিষেক করাইলেন এবং পরে দুইখানি নববস্ত্র পরিধান করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দনানুলেপ পূর্ব্বক উভয়ের গলদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। পরে পরস্পর পাশাপাশি দুইটা চিতা সজ্জিত হইল—যথাবিধানে মৃত দেহ দ্বয় সেই চিতার উপরে শায়িত হইল। তখন সহসা সেই শ্মশান ভূমিতে শোভারাশি ফুটিয়া উঠিল। সেই সায়াহ্ণ গগণের সেই অতুল্য-সৌন্দর্য্যরাশি, যেন সে শোভার নিকট পরাজয় মানিল। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত বিমোহিত-নেত্রে হেমলতা ও প্রবোধচন্দ্রের সেই শোভারাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আপনা ভুলিয়া সকলেই একবার হরিধ্বনি করিলেন।

পরে যোগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে হেমলতার চিতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে কহিলেন, "ভগিনী! হৃদয়ের বড় সাধ ছিল যে, তোমাকে স্বহস্তে রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া তোমার হৃদয় দেবতার পার্শ্বে ... দিব, কিন্তু এ জীবনে তাহা হইল না। নিষ্ঠুর সংসার আমার সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দিলনা। কিন্তু আজ আমি এইরূপে আমার সেই সাধ-পরিপূর্ণ করিলাম। যাও ভগিনী, যাও! যেখানে সংসারের জ্বালা নাই, মরমের বেদনা নাই, প্রণয়ে নৈরাশ্য নাই, সেই অনন্ত ধামে, অনন্ত-পুরুষের নিকটে গিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমার হৃদয় দেবতার পূজা কর। সেখানে তোমাদের জন্য অনন্ত সুখ, অনন্ত সৌভাগ্য সঞ্চিত রহিয়াছে।"—পরে প্রবোধচন্দ্রের উদ্দেশে কহিলেন, "যাও, ভাই, যাও! বিবাহের আনন্দ-নিকেতনে তোমাদের বাসর-সজ্জা দেখিয়া সুখী হইতে পারি নাই, আজ অন্তিমে তোমাদিগের 'অপূর্ব্ব-বাসর' সাজাইয়া দিলাম। প্রেমময়ের চিরানন্দ নিকেতনে গিয়া তোমরা অনন্ত সুখ সম্ভোগ কর।" বলিতে বলিতে বিষম শোক প্রবাহে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া চক্ষু মুছিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইহাঁরা যেরূপ দেব-ভাবে, যেরূপ পবিত্রতার সহিত নশ্বর জীবন অতিবাহিত করিলেন, পাপময় সংসারের পাপ প্রলোভনকে বিনষ্ট করিয়া এরূপ দৃঢ়তার সহিত হৃদয়ের অসহ্য অনন্ত যাতনা আপন হৃদয়েই চাপিয়া রাখিয়া এই অনিত্য সংসার হইতে চলিয়া গেলেন, আমরাও আজ ইহাঁদিগের পবিত্র দেহের সেই পবিত্রতা রক্ষা করিলাম।" ইহা বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিবামাত্র ধূ ধূ করিয়া চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রদোষ কালীন নিস্তব্ধ বায়ু-স্তর

ভেদ করিয়া চিতার ধূমরাশি ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল
যোগেন্দ্রনাথ সজল নয়নে ঊর্দ্ধমুখে, শূন্যদৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহি